লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

১৯১৩-২০১৩ 1913–2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

পাক্ষিক আহ্‌মদী
The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ১৩তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ০২ মাঘ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ০২ রবিউল-আউয়াল, ১৪৩৪ হিজরি | ১৫ সুলাহ্, ১৩৯২ হি. শা. | ১৫ জানুয়ারী, ২০১৩ ঈসাব্দ

আবারও সত্যের সন্ধানে
২৪ জানুয়ারী থেকে ২৭ জানুয়ারী টানা ৪ দিন ব্যাপী
টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ sslive@mta.com

২০১১ সালে জলসায় আগত সেজদাবনত মুসল্লিগণ

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Member | REHAB

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica
tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
CEO

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier), Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

১৫ জানুয়ারী, ২০১৩

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর প্রদত্ত জুমুআর খুতবা (২৯ জুন, ২০১২) বিষয়: তাক্বওয়া অর্জনই জলসার মূল উদ্দেশ্য	৫
হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সা.)-এর দিব্য দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী — আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ	১১
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (১লা জানুয়ারী)	১৪
জলসা সালানায় যোগদানের গুরুত্ব	১৬
মানবতার কল্যাণে মহানবী (সা.)-এর সুমহান শিক্ষা ও আদর্শ — মুহাম্মদ খলীলুর রহমান	১৭
শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) — মাহমুদ আহমদ সুমন	২২
ইসলামে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, অতিথি আপ্যায়ন ও আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য — মোহাম্মদ আবদুল জলিল	২৪
প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি — মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৮
আমার বয়আত গ্রহণ ও ঐশী দিনর্শন — মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান	৩০
নবীনদের পাতা-	৩১
সংবাদ	৩৪
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৬

জলসা সালানা: আহমদীয়তের সত্যতা

আহমদীয়তের সত্যতার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু জলসা সালানা আহমদীয়তের সত্যতার এমন এক বাস্তব ও আন্তর্জাতিক নিদর্শন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিই এটা অস্বীকার করতে পারেন না। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আহমদীয়তের ৭৫ জন বিদগ্ধ মহান ব্যক্তিদের নিয়ে অজানা অচেনা নিভৃত এক জনপদ কাদিয়ান থেকে এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিলো। এখন কেবল জলসা গাহে হাজার হাজার উপস্থিত পাগলপারা আহমদীদের মধ্যেই এ জলসা সীমাবদ্ধ নয়, MTA-এর সম্প্রচারে সারা বিশ্বের ২০২টি দেশের কোটি কোটি মানব হৃদয়ের পিপাসা মেটাতে অমৃত সুধা বিতরণে সঞ্জীবিত ও বিমোহিত করে চলছে এ জলসা।

এতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও রং-এর মানুষেরা স্ব-দেশের কৃষ্টি-কালচার নিয়ে উপস্থিত হলেও জলসায় মহা-মিলনের মোহনায় একাত্ম হয়ে থাকেন। সালানা জলসার এই যে মনোহারী রূপ তা আচমকা কোন ঘটনা নয়। এ প্রসঙ্গে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালামের কাছে আল্লাহ্ তাআলা আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ইলহামের মাধ্যমে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেনঃ ***ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন 'আমীক ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন 'আমীক*** অর্থাৎ যদিও এখন তুমি একা কিন্তু তোমার কাছে এমন যুগও আসবে যখন তুমি একা থাকবে না। দলে দলে লোক দূর দূরান্তের দেশ থেকে তোমার কাছে আসবে। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী বড়ই শান ও শওকতের সাথে পূর্ণ হয়ে চলছে। চরম বিরোধিতা নির্জলা মিথ্যারোপ ও চক্রান্ত সত্ত্বেও খোদা তাআলা এ জামাতকে বাড়িয়ে চলছেন। জামাত একদিকে দিন দিন জাঁকজমকের সাথে অগ্রসর হচ্ছে অপর দিকে এর বিরোধীরা নাস্তানাবুদ হয়ে চলছে সর্বক্ষেত্রে।

কাদিয়ানের বাইরে যে লোককে কেউ চিনতো না জানতো না ঐশী সুসংবাদসমূহ যথাসময়ে তাঁকে এতই ইজ্জত ও সম্মান দিয়ে চলছে যে কেবল হিন্দুস্তানেই নয় বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের ২০২টি রাষ্ট্রসহ বিশ্বের কোণে কোণে তাঁর নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং তিনি বলেন, *"আমার নিকট তো এ নিদর্শনই যথেষ্ট যে, এত-এত লোক এখানে আসে, যাদের প্রত্যেকে এক একটি নিদর্শন আর খোদা তাআলা এদের সকলকে আগেই খবর দিয়ে রেখেছেন আর এসব সাহায্য ও সমর্থন যা কিনা আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা এসব ব্যাপারে আগেই আমাদের সাথে অঙ্গীকার করে রেখেছেন। কিন্তু যে মিথ্যাবাদী ও আল্লাহর নামে মিথ্যা রটনাকারী হয় খোদা কখনও তাকে সাহায্য করেন না। বরং উল্টো ধ্বংসই করে দেন"* (মলফূযাত, পঞ্চম খন্ড, নবরূপে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ৩৭৭-৩৭৮)।

তিনি (আ.) আরও বলেন, বারাহীনে লিখা রয়েছে ***"ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন 'আমীক ওয়া ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন 'আমীক" এ নিদর্শনকে যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে স্বীয়স্থানে এটা দশ লক্ষ নিদর্শনের সমান প্রতিভাত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যিনিই নবাগত অতিথি হয়ে আসছেন তিনি এ নিদর্শন পুরো করে চলছেন। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চল ও স্থান থেকে চিঠি পত্র আসছে, আসছে উপহার সামগ্রীও.... এত কিছুর পরও এটা কি কেবলই ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখবার বিষয় হতে পারে?'*** (মলফূযাত, ২য় খন্ড, নবরূপে মুদ্রিত পৃষ্ঠা ৫৩২)। আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপায় আমাদের দেশেও এ জলসা নিয়মিত হয়ে আসছে আর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভের সাক্ষ্য বহন করছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদযাপনের এই বছরে আগামী ৮, ৯ এবং ১০ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ৮৯ তম জলসা সালানা। বরকতপূর্ণ এই জলসা সকলের অংশগ্রহণে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আধ্যাত্মিক এক নব-উন্মেষের সূচনার কারণ হোক আর আমাদের রাষ্ট্রীয়-জীবনেও প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনুক।

সকলকে জলসায় অংশগ্রহণের সাদর আমন্ত্রণ

কুরআন শরীফ

সূরা আর রা'দ-১৩

৪১। আর আমরা যেসব সতর্কীকরণমূলক প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দিয়েছি এর কোন অংশ আমরা যদি তোমাকে পূর্ণ করে দেখাই অথবা আমরা যদি তোমাকে (এর আগেই) মৃত্যু দিয়ে দেই তবে (উভয় অবস্থায়) তোমার দায়িত্ব হলো কেবল সুস্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছে দেয়া এবং হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমাদের।

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

৪২। আর তারা কি লক্ষ্য করে না নিশ্চয় আমরা পৃথিবীকে এর চারদিক[১৪৫১] থেকে সংকুচিত করে আনছি? আর সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ই করেন। কেউ তার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে না এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا
وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤٢﴾

৪৩। আর তাদের পূর্ববর্তীরাও অবশ্যই পরিকল্পনা করেছিল। তবে সব পরিকল্পনা আল্লাহ্রই[১৪৫১-ক] কর্তৃত্বাধীন। প্রত্যেকে যা অর্জন করে তিনি তা জানেন। আর পরকালের উত্তম আবাস কার জন্য, অস্বীকারকারীরা তা অবশ্যই জানতে পারবে।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا
يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ
عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৪। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, তুমি (আল্লাহ্ কর্তৃক) প্রেরিত নও।' তুমি বলে দাও, আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং যার কাছে এ কিতাবের[১৪৫১-খ] জ্ঞান আছে সে-ও (সাক্ষী)।'

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ
شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ﴿٤٤﴾

১৪৫১। 'আতরাফ' অর্থ কোন বস্তুর শেষসীমা বা কিনারা, সাধু-সজ্জন এবং নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকও বুঝায়। এই আয়াতের অর্থ : তারা কি দেখে না, আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীকে এর কিনারা থেকে সংকুচিত করে এনেছেন? অর্থাৎ- ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে আরবের সকল স্থানে, প্রত্যেক গৃহে, সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এবং সর্বপ্রকার সমাজে বড়-ছোট, ধনী-নির্ধন, দাস এবং প্রভু প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে।

১৪৫১-ক। ইসলামের শত্রুদের সকল গোপন-ষড়যন্ত্রের কথা আল্লাহ্ তাআলা ভালভাবে জানেন। কাজেই তাদের প্রতারণাপূর্ণ কৌশলের কোন পরিকল্পনাই তাঁর (আল্লাহ্) উদ্দেশ্যকে ইসলামের চরম বিজয়কে ব্যর্থ করতে পারবে না।

১৪৫১-খ। 'এ কিতাবের জ্ঞান' বাকাংশ দ্বারা নতুন ঐশী নিদর্শনাবলী এবং পূববর্তী ধর্মের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত নবী করীম (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বুঝাতে পারে।

হাদীস শরীফ

উত্তম পারিবারিক জীবন
স্বামী-স্ত্রীর সোহার্দ্য ও সন্তানের সুশিক্ষা

হযরত মুয়াবিয়া বিন হাইদাহ রাযি আল্লাহুতা'লা আনহু বলেন : আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করলাম : হে আল্লাহ্‌র রসূল! স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার কি? তিনি (সা.) বললেন, যা তুমি খাও, তাকেও তা-ই খাওয়াবে। যা তুমি পর, তাকেও তা-ই পরাবে। তার চেহারায় কোন আঘাত করবে না। তার কোন ভুলের দরুন যদি তাকে শিখানোর জন্য তোমাকে পৃথক থাকতে হয়, তবে গৃহ মধ্যে তা করবে, ঘর হতে বের করবে না। [আবু দাউদ]

হযরত সুবহান বিন বুহুদুদ রাযি আল্লাহুতা'লা আনহু, যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিলেন, তিনি বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'সর্বোৎকৃষ্ট ব্যয় হচ্ছে সেই ব্যয় যা সে আপন পরিবার-পরিজনের জন্য, বা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে তার সহযোগিতার জন্য ব্যয় করে। [মুসলিম]

হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন , 'আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি যদি কাউকে আদেশ করতে পারতাম যে, সে অন্য কাউকে সিজদা করে, তবে স্ত্রীকে বলতাম, তুমি তোমার স্বামীকে সিজদা করবে।" [তিরমিযী]

হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না এবং তার অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে আসতে দিবে না। [বুখারী]

হযরত ইবনে উমর রাযি আল্লাহু আনহু বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : হালাল (বৈধ) বিষয়গুলির মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ও অপসন্দনীয় বিষয় হচ্ছে ত্বালাক। অর্থাৎ-প্রয়োজনের ভিত্তিতে এর অনুমতি তো আছে, কিন্তু তা খোদা তাআলার ভীষণ অপসন্দনীয় বিষয়। (আবু দাউদ)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি আল্লাহু আনহু বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী-গমনের সময় এই দোয়া করে : আল্লাহ্‌র নামের সাথে। আল্লাহ্‌, আমাদেরকে শয়তান হতে রক্ষা কর এবং এই সন্তানকেও শয়তান হতে নিরাপদ রাখ, যা আমাদেরকে দিবে'–তবে তাদের জন্য কোন সন্তান, আল্লাহ্‌ তাআলার সংকল্প থাকলে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। [বুখারী]

হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহুতা'লা আনহা বলেন : একদিন এক দরিদ্র স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসল। তার দু'টি শিশু বালিকাকে সে বহন করছিল। আমি তাকে তিনটি খেজুর দিলাম। সে দুই বালিকাকে এক একটি খেজুর দিল এবং একটা খেজুর তার নিজ মুখে দিল। কিন্তু সে খেজুরটাও তার মেয়েরা তার নিকট চেয়ে বসল। এতে সে ঐ খেজুরটি তার মুখ হতে বের করল। তা দুই ভাগ করল একটা অংশ এক মেয়েকে এবং অন্য অংশটা অন্য মেয়েটিকে দিল। আমি তার মাতৃস্নেহ দেখে আশ্চর্য হলাম এবং 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে তা বললাম। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌ তাআলা তার এই কর্মের কারণে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করেছেন। অথবা তিনি উল্লেখ করে ছিলেন যে, তার এই অপত্য স্নেহের কারণে তিনি তাকে আগুন হতে রক্ষা করলেন। [হাদিকাতুস সালেহীন]

সংকলন: *এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার*

অমৃতবাণী

তত্ত্ব-জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত হতে দোয়া কর

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

মুহাদ্দাসের মর্যাদা নবীর পদমর্যাদার সাথে গভীরভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই দুইয়ের মাঝে অন্তর্নিহিত যোগ্যতা এবং এর কার্যকারিতার পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য নেই। এরা আমার কথা না বুঝে বলে বসেছে, এই ব্যক্তি নবী হবার দাবী করে! খোদা তা'লা জানেন, তাদের এ কথাটি ডাহা মিথ্যা, এর সাথে সত্যের কোন সংশ্রব নেই এবং প্রকৃতপক্ষে এর কোন ভিত্তিই নেই। মানুষকে নিছক কুফরী, গালমন্দ, অভিশম্পাত, শত্রুতা ও নৈরাজ্যে উসকে দেয়া আর মু'মিনদের মাঝে ভেদাভেদ সৃষ্টির উদ্দ্যেশ্যেই তারা একথা রটিয়েছে।

খোদার কসম! আমি খোদা ও তাঁর রসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, আর আমি বিশ্বাস রাখি, তিনি খাতামান নবীঈন। অবশ্য আমি একথা বলেছি, সকল তাহদিসেই (বান্দার সাথে খোদার কথোপকোথন) নবুওয়তের অংশ পাওয়া যায়, কিন্তু তা অন্তর্নিহিতভাবে থাকে, কার্যতঃ নয়। অতএব, মুহাদ্দাস অন্তর্নিহিত যোগ্যতা ও স্বরূপের দিক থেকে নবী হয়ে থাকেন। যদি নবুওয়তের দ্বার রুদ্ধ না হতো, তাহলে কার্যতঃ তিনি নবীই হতেন। আর এ বিষয়ে আমাদের এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে যে, মোহাদ্দাসের পরম উৎকর্ষের নামই নবী। কেননা, তিনি তাঁর সকল গুণাবলীর সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীন প্রতিফলন হয়ে থাকেন ......একইভাবে একথা বলাও বৈধ হবে, মুহাদ্দাস নিজ সুপ্ত-গুণাবলীর নিরিখে নবী, অর্থাৎ- মুহাদ্দাস অন্তর্নিহিত যোগ্যতার নিরিখে নবী। নবুওয়তের যাবতীয় উৎকর্ষ পুরোপুরিই মুহাদ্দাসের মাঝে প্রচ্ছন্ন ও সুপ্ত থাকে। নবুওয়তের প্রতিবন্ধকতাই কার্যতঃ এর প্রকাশ ও আবির্ভাবের পথ রুদ্ধ রেখেছে। মহানবী (সা.) 'আমার পরে নবী থাকলে ওমর নবী হতো' উক্তিতে এদিকেই ইশারা করেছেন। ওমর (রা.)-এর মুহাদ্দাস হবার ভিত্তিতেই তিনি একথা বলেছেন। অতএব তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, মুহাদ্দাসের মাঝে নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য ও বীজ সুপ্ত থাকে, কিন্তু খোদা তা'লা সেই অন্তর্নিহিত যোগ্যতাকে কার্যকর রূপ দিতে চাননি। আর ইবনে আব্বাসের ***'ওয়া মা আরসালনা মির রসূলীন ওয়া লা নবীইন ওয়া লা মুহাদ্দাসিন'*** কেরাআতটিও এ দিকেই ইঙ্গিত করে। দেখ! কীভাবে নবী, রাসূল ও মুহাদ্দাসদের, এই কেরাআতে একই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে! আর খোদা তা'লা বলেন, তাঁরা সকলেই নিষ্কলুষ ও রাসূলদের অন্তর্গত।

নি:সন্দেহে, মুহাদ্দাসীয়্যত সম্পূর্ণভাবে খোদার দান। এটি আদৌ চেষ্টা করে অর্জন করা যায় না। যেভাবে নবুওয়তের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। তিনি মুহাদ্দাসদের সাথে সেভাবেই কথা বলেন, যেভাবে নবীদের সাথে কথা বলেন। মুহাদ্দাসদের সেভাবে প্রেরণ করা হয় যেভাবে রাসূলদের প্রেরণ করে থাকেন। মুহাদ্দাস সেই একই ঝর্ণা থেকে আধ্যাত্মিক সুধা পান করেন, যেখান থেকে নবী পান করেন। যদি দ্বার রুদ্ধ না হতো, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি নবী হতেন। রাসূলুল্লাহ্ যে হযরত ওমর (রা.)-কে মুহাদ্দাস আখ্যা দিয়েছেন, তার রহস্য এটিই, যার সাথে তাঁর এই উক্তিও রয়েছে, 'আমার পর নবী হবার থাকলে ওমর নবী হতো'। এটি কেবল এদিকে ইঙ্গিত করে, একজন মুহাদ্দাস নিজের মাঝে নবুওয়তের যাবতীয় উৎকর্ষ ধারণ করে থাকেন। অতএব, তফাৎ কেবল প্রকাশিত গুণ এবং অন্তর্নিহিত গুণের এবং অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত যোগ্যতা এবং সেই যোগ্যতার বাহ্যিক প্রতিফলনের। কাজেই নবুওয়তের উপমা হলো, একটি বাহ্যিক ফলবতী গাছের মত, যা অজস্র ফলবহন করে, আর তাহদীস এক বীজ সদৃশ, যাতে অন্তর্নিহিত সেসব কিছু থাকে, যা কার্যতঃ ও বাহ্যতঃ বৃক্ষে থেকে থাকে। যারা ধর্মের নিগুঢ় তত্ত্বের সন্ধানে থাকে, তাদের জন্য এটি একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। 'আমার উম্মতের আলেমরা বনী ঈস্রাইলী নবীদের ন্যায়'-এ হাদীসে মহানবী (সা.) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এখানে ওলামা বলতে সেসব মুহাদ্দাসদের বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে নিজ প্রভুর সন্নিধান থেকে জ্ঞান দেয়া হয়ে থাকে এবং তারা সম্বোধিত হন।

কিছু সংখ্যক মানুষের জন্য নবুওয়ত ও তাহদীসের মাঝে পার্থক্য করা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য শুধু অন্তর্নিহিত সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রকাশিত কার্যে রূপায়িত ব্যক্তির। যেমনটি এখনই আমি বৃক্ষ ও বীজের দৃষ্টান্তের আলোকে স্পষ্ট করেছি। অতএব, আমার এ কথা গ্রহন করো, আর খোদা ছাড়া কাউকে ভয় করো না। এছাড়া খাদার কাছে দোয়া করো, যেন তুমি তত্ত্বজ্ঞানীদের শ্রেণীভূক্ত হতে পারো।

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত 'হামামাতুল বুশরা' বাংলা সংস্করণ পৃ: ১৪৬-৪৭ থেকে উদ্ধৃত]

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৯ জুন ২০১২-এর (২৯ এহসান, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

তাক্বওয়া অর্জনই জলসার মূল উদ্দেশ্য

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

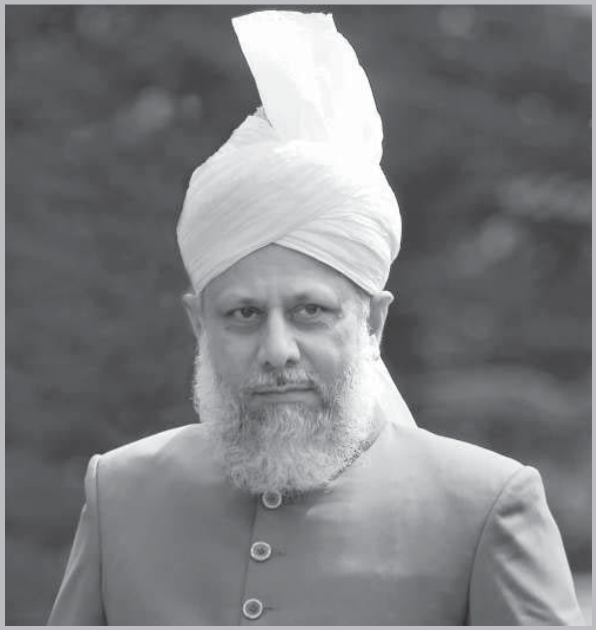

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আমেরিকার বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। দ্বিতীয়বারের মত আজ আমি এ জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জামাতগুলোতে আমাদের যেসব জলসা অনুষ্ঠিত হয় তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত কাদিয়ানের জলসার আদলে হয়ে থাকে। জামাতের সদস্যদেরকে প্রকৃত কল্যাণের উত্তরাধিকারী বানানোই ছিল এর মূখ্য উদ্দেশ্য। যা জামাতের সদস্যদের ইহ ও পরকালকে সুনিশ্চিত করেছে। আর একে তারা নিজেদের জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে আশিস ও কল্যাণের উত্তরাধিকারী হতে থাকবে। আর সত্যিকার খোদাভীতি অবলম্বনের ফলেই এ কল্যাণরাজি লাভ হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক আহমদীর কাছে এ মান অর্জনের প্রত্যাশা রেখেছেন এবং সেসব লক্ষ্য অর্জনের প্রতি যারা দৃষ্টিপাত করে না তাদের প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

অতএব এ জলসা যেখানে কল্যাণরাজির উপকরণ নিয়ে আসে সেখানে একজন সত্যিকার আহমদীর জন্য বড় ভয়ের কারণও বটে। আল্লাহ্ তা'লা বছরে একবার তাকে একটি বিশেষ পরিবেশে অবস্থান করে আত্মসংশোধনের সুযোগ দিয়েছেন। নিজের দুর্বলতাগুলো দূর করার সুযোগ করে দিয়েছেন। নবোদ্যমে নিজের ঈমান, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতায় ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টির এবং একে দৃঢ় করার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু তা অর্জন করা এবং এসবের সদ্ব্যহারের পুরো চেষ্টা করা হয়নি। আর চেষ্টা করা হলেও পরবর্তিতে তা আর ধরে রাখতে পারেনি। একজন আহমদী জলসার কল্যাণরাজি এবং আশিস যদি সঠিকভাবে উপলব্ধি করে আর তা অর্জনেরও চেষ্টা করে, তারপর প্রতি বছর

জলসায় যোগদানের মাধ্যমে এসব কল্যাণ এবং পবিত্র পরিবর্তন একত্রিত করতে থাকে, তাহলে আমরা প্রতি বছর প্রত্যেক আহমদীকে তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির নিত্য নতুন সোপান মাড়াতে দেখব। আর উন্নতির এই সোপানই আমাদেরকে ঐ স্থানে উপনীত করবে যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দেখতে চান।

অতএব জলসায় অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আন্তরিক ইচ্ছার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। জলসা আয়োজন করার পেছনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে উদ্দেশ্য ছিল, সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। তিনি সেই উদ্দেশ্য এভাবে বর্ণনা করেছেন, ***'এ জগত সংসারের চেয়ে পরকালের প্রতি বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়'।*** আর মনোযোগ নিবদ্ধ করা ও পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে এ মানে উপনীত হবার জন্য তিনি একথার প্রতি অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন, অর্থাৎ ***'তোমরা নিজেদের ভেতর তাক্বওয়া সৃষ্টি কর'।*** অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়-ভীতি রেখে আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান কর এবং মানবাধিকারও আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে প্রদান কর; আর এরই নাম তাক্বওয়া। আল্লাহ্‌র অধিকার সমুহের মধ্যে আল্লাহ্‌র ইবাদত হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আর ইবাদতের মধ্যে নামায সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, ***'এটি ইবাদতের সার বা মগজ'।*** একজন সত্যিকার মু'মিনের এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং আল্লাহ্ তা'লার এই অধিকার সম্পর্কে গত খুতবায় আমি আলোকপাত করেছিলাম। যারা তা শোনেন নি, তারা এটি শুনুন এবং নিজ ইবাদতের নূন্যতম মান অর্জনের চেষ্টা করুন। আপনি যখন এ জলসায় নামাযের প্রতি মনোযোগী হবেন অথবা পরিবেশের কারণে আপনাকে যখন বাজামাত নামায পড়তে হবে তখন একে আপনাদের জীবনের অংশ বানিয়ে নিন। জলসার দিনগুলোতে বিশেষভাবে এই দোয়া করুন এবং চেষ্টা করুন যাতে আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে স্বীয় এই ফরয এবং আল্লাহ্ তা'লার এ অধিকারকে যথার্থভাবে প্রদান করার সৌভাগ্য দান করেন। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিতে চাই আর তা হল, জলসার অনুষ্ঠান ও দূর-দূরান্ত থেকে আগত মুসাফিরদের জন্য নামায জমা পড়ানো হয় আর শরীয়ত এর অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু নিজেদের বাড়িতে এবং কোন কারণ ছাড়া নামায জমা করার কোন অনুমতি নেই। মনে হয় কোন কোন বাড়িতে নিয়মিত নামায জমা করা হয়। কেননা ছেলে-মেয়েদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়, দিনে কয় ওয়াক্ত নামায পড়তে হয়? তখন অনেকে উত্তর দেয়, তিন ওয়াক্ত। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, সেসব বাড়িতে যথারীতি নামাযের ব্যবস্থা নেই। পবিত্র কুরআন পাঁচ বেলার নামায আবশ্যক করেছে। মহানবী (সা.) তাঁর সুন্নতের মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় সম্বন্ধেও অবহিত করেছেন আর তা (নামায) কীভাবে পড়তে হবে তাও দেখিয়ে দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ের প্রতি বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গত খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে আমি এ বিষয়ে যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

অতএব গুরুত্বপূর্ণ এ দায়িত্বের প্রতি অধিক মনোযোগ দিন এবং তাক্বওয়ার মানকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের জন্য শুধু নামায পড়াকেই যেন যথেষ্ট মনে করা না হয়। বরং অন্যান্য ইবাদতও আবশ্যক আর তা পালন করাও জরুরী। এছাড়া নফল পড়াও আবশ্যক। নিজেদের নামায সমূহকে নফল দ্বারা সুসজ্জিত করুন। তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য নফলের প্রতিও মনোযোগী হোন। এ তিন দিনে তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি অনেকেরই মনোযোগ নিবদ্ধ হবে, যেহেতু মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছে এখন একে জীবনের অংশ বানিয়ে নিন। কেননা ফরযের ঘাটতি নফল দ্বারা পূর্ণ হয়, আর নফলের মধ্যে তাহাজ্জুদের গুরুত্ব অপরিসীম।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, ***'আমাদের জামাতের উচিত তারা যেন তাহাজ্জুদ নামাযকে আবশ্যক জ্ঞান করে। যে বেশি পড়তে পারে না সে যেন কমপক্ষে দু'রাকাতই পড়ে কেননা সে এতে দোয়া করার সুযোগ পাবে, সে সময়ের দোয়াতে এক প্রকার বিশেষ প্রভাব থাকে। কেননা সত্যিকার আবেগ ও বেদনার সাথে তা নির্গত হয়'।*** হুযূর (আ.) বলেন, ***'হৃদয়ে এক প্রকার জ্বালা ও বিশেষ বেদনা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি আরামের ঘুম ভেঙ্গে উঠতে পারে না। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া বলে দেয়, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অন্বেষণে মানুষ তার ঘুম পরিত্যাগ করে'।***

তিনি (আ.) বলেন, ***'অতএব সে সময় জাগ্রত হওয়াই মূলতঃ হৃদয়ে এক প্রকার বেদনা সৃষ্টি করে যারফলে দোয়াতে আকুতি-মিনতি ও ব্যাকুলতার অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং এই ব্যাকুলতা ও অস্থিরতাই দোয়া গৃহীত হবার কারণ হয়'।***

অতএব এই হল তাহাজ্জুদের গুরুত্ব। এর জন্য জাগ্রত হওয়াই মানুষের মাঝে এক ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে যার জন্য অধিকাংশ মানুষ রাতে দেরীতে ঘুমায়। নিঃসন্দেহে এ অবস্থায় তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা তাক্বওয়া ও পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির অনেক বড় একটি মাধ্যম। অতএব ইবাদতের এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা মানুষকে যেখানে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদান করে সেখানে মানুষের নিজের উপকারের জন্যও বড় শক্তিশালী অস্ত্র।

একজন সত্যিকারের মু'মিনের উপর আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের পর সবচেয়ে বড় অর্পিত দায়িত্ব হল, তার ভাইয়ের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। এ হল মানবের অধিকার যা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য। মানবতার স্বার্থে পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) বারংবার উপদেশ দিয়েছেন। আর এ প্রেক্ষিতে একজন মু'মিনের অপর মু'মিনের উপর অধিকার অনেক বেশি। এ ব্যাপারে মহানবী (সা.) জোরালোভাবে উপদেশ দিয়েছেন যা পালনের চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

‘তোমরা যারা আমার হাতে বয়আত করেছ, আর আমাকে মসীহ্ মওউদ ও ন্যায় বিচারক হিসেবে মান্য করেছ, আমাকে মানার পর আমার কোন সিদ্ধান্ত বা কর্মের বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ে যদি কোন ধরনের সংশয় থাকে তাহলে নিজের ঈমানের বিষয়ে চিন্তা কর। যে ঈমান সংশয় ও সন্দেহে ভরা তা ফলপ্রদ হয় না। কিন্তু যদি তুমি সত্য নিষ্ঠ হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে, সত্যিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ন্যায় বিচারক, তাহলে তাঁর সিদ্ধান্ত ও কর্মের সামনে সমর্পণ কর। আর তাঁর সিদ্ধান্তগুলোকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখ; যাতে তুমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র উক্তিকে সম্মান ও মাহত্ম্য প্রদানকারী সাব্যস্ত হতে পার। রসূল (সা.)-এর এই সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, তিনি তোমাদের ইমাম হবেন আর তিনি ন্যায় বিচারকের আসনে বসে সুবিচার করবেন’।

তিনি (আ.) বলেন, ***‘অপরের জন্য নিজ হৃদয়ে নম্রতা, মমতা ও সহানুভূতি সৃষ্টি কর। আর তা যেন শুধু জলসা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ না থাকে বরং দৈনন্দিন জীবনেও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটা চাই’।*** অনেক সময় ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে এক ভাই অপর ভাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় আর আমি দেখেছি, অনেক সময় কয়েক বছর পর্যন্ত তারা অসন্তুষ্ট থাকে। আর এই অসন্তুষ্টি পরবর্তিতে অন্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও ছড়িয়ে পরে। এছাড়া নম্রতা, স্নেহ ও সহমর্মিতা এবং পরস্পরের অনুভূতির প্রতি যত্নবান হবার ক্ষেত্রে যদি ঘাটতি দেখা দেয় এবং অনেক সময় যখন ঘরেও সহানুভূতির অভাব দেখা দয়ে তখন সংসার ভাঙ্গতে আরম্ভ করে। এক সময় আমরা বলতাম, অতিরিক্ত স্বাধীনতার কারণে পাশ্চাত্যে পারিবারিক অশান্তি এবং তালাকের হার অনেক বেশী। এখানে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের আবেগ ও অনুভূতির প্রতি যত্নবান নয়। এক পর্যায়ে তারা একে অপরের সঙ্গে নম্রতা ও প্রেম-প্রীতির সাথে কথা বলা পছন্দ করে না। পরিণামে তাদের ভালবাসা শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। এর কারণ হল, এখানকার পরিবেশের কারণে পরস্পরের প্রতি আস্থা থাকে না। অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে এবং পরিণামে সংসার ভেঙ্গে যায়। এটি আমাদের জন্যও অনেক চিন্তার বিষয়, আহমদী পরিবারগুলোতে দিন দিন অশান্তি বেড়ে চলেছে এবং এর দরুন সংসার ভাঙছে। বিভিন্ন স্থান থেকে কাযা ও জামাতের ইসলাহী কমিটির যে রিপোর্ট আমি পাই তা থেকে জানা যায় অধিকাংশ স্থানে তালাক ও খোলার হার বেড়ে চলেছে।

অতএব প্রত্যেক আহমদীকে নম্রতা, স্নেহ ও সহানুভূতির প্রতিটি দিক অবলম্বন করা আবশ্যক। আর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের গন্ডিকে প্রসারিত করতে হবে তবেই আমরা প্রকৃত আহমদী হতে পারব। কাজেই এ জলসায়ও বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি দিন আর এর উন্নত মান অর্জনের চেষ্টা করুন এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকার করুন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে পূর্ণ আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছি। আমাদের সর্বদা একথা মনে রাখতে হবে, আমরা পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করার ও তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকার নবায়ন করেছি। নতুবা আমরা বয়আতের অঙ্গীকারও পুর্ণ করতে পারব না আর না-ই জলসার কল্যাণ হতে লাভবান হতে পারব। জলসার দিনগুলোতে আপনারা নযম ও তারানা পড়েন, এমটিএ’তে সরাসরি সম্প্রচারের ফলে তাতে আমেজ সৃষ্টির প্রয়াস চলে। অত্যন্ত জোরালো কণ্ঠে ‘এদিন কল্যানের’ নযম পাঠ করা হয়। কাজেই বরকতের দিনগুলো থেকে লাভবান হবার জন্য তাক্বওয়া অর্জন আবশ্যক। আল্লাহ্ তা’লা ও তাঁর রসূলের শিক্ষা পূর্ণরূপে অনুসরণ করা প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা আবশ্যক নতুবা কল্যাণের দিন হলেও আমরা তা থেকে লাভবান হতে পারব না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ***‘তোমরা কোন জাগতিক মেলায় আসো নি যে, যতটা লাভবান হবার হলে আর চলে গেলে। বরং এর প্রকৃত কল্যাণে ভূষিত হবার চেষ্টা কর’।*** এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে কি চান? তৎসংক্রান্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিটি কথা বরং এক একটি কথা এমন যার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক ব্যক্তি খোদাপ্রেমিক মানুষে পরিণত হতে পারে। স্বীয় নেতা ও অনুসরণীয় মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে মানুষকে খোদাভক্ত মানুষে পরিণত করাই ছিল তাঁকে প্রেরণের উদ্দেশ্য। সর্ব প্রথম আমি তাঁর ভাষায় তাঁর পদমর্যাদা ও এর গুরুত্ব এবং তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের বিষয় বর্ণনা করছি। তিনি (আ.) বলেছেন, ***‘তোমরা যারা আমার হাতে বয়আত করেছ, আর আমাকে মসীহ্ মওউদ ও ন্যায় বিচারক হিসেবে মান্য করেছ, আমাকে মানার পর আমার কোন সিদ্ধান্ত বা কর্মের বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ে যদি কোন ধরনের সংশয় থাকে তাহলে নিজের ঈমানের বিষয়ে চিন্তা কর। যে ঈমান সংশয় ও সন্দেহে ভরা তা ফলপ্রদ হয় না। কিন্তু***

যদি তুমি সত্য নিষ্ঠ হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে, সত্যিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ন্যায় বিচারক, তাহলে তাঁর সিদ্ধান্ত ও কর্মের সামনে সমর্পণ কর। আর তাঁর সিদ্ধান্তগুলোকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখ; যাতে তুমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র উক্তিকে সম্মান ও মাহত্ম্য প্রদানকারী সাব্যস্ত হতে পার। রসূল (সা.)-এর এই সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, তিনি তোমাদের ইমাম হবেন আর তিনি ন্যায় বিচারকের আসনে বসে সুবিচার করবেন'।

আমরা যদি তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পূর্ণরূপে অনুসরণের চেষ্টা করি কেবল তখনই তাঁর (আ.) সিদ্ধান্তসমূহকে সম্মান প্রদানকারী গণ্য হতে পারি। তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, তাঁর কথা ও তাঁর সিদ্ধান্তকে যারা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং তদনুসারে চলে তারা কেবল তাঁর কথার প্রতিই শ্রদ্ধাশীল নয় বরং মহানবী (সা.)-এর কথাকেও সম্মান ও মাহত্ম্য প্রদান করে।

অতএব এটি আমাদের সৌভাগ্য, আমরা সে-ই ইমামকে গ্রহণ করেছি, যিনি সব কথা প্রাঞ্জলভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যেন কেউ বলতে না পারে যে, মহানবী (সা.) যে বিষয় বর্ণনা করেছিলেন তা আমরা বুঝতে ভুল করেছি। অতএব একজন আহমদী যখন বয়আত করে তখন সর্বদা তার নিজ দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জাগতিক কামনা-বাসনা ও জাগতিক চাওয়া-পাওয়া যাকে বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করা থেকে দূরে ঠেলে দেয় প্রকৃতপক্ষে এমন মানুষের বয়াতের অঙ্গীকার আর বয়আতের অঙ্গীকার থাকে না।

অতএব জলসার এ দিনগুলোতে এই দিক থেকেও প্রত্যেক আহমদীকে আত্মবিশ্লেষণ করা আবশ্যক। জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, *'খোদা তা'লা এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন আর এর সমর্থনে শত শত নিদর্শন প্রকাশ করেছেন– কেননা এটি সাহাবার জামাত। দ্বিতীয়তঃ যেন খায়রুল কুরুন অর্থাৎ প্রথম শতাব্দীগুলোর সোনালী যুগ আবার ফিরে আসে। যারা এই জামাতে প্রবেশ করবেন তারা যেহেতু ওয়া আখারিনা মিনহুমের গন্ডিভূক্ত তাই তারা যেন মিথ্যা কার্যকলাপের পোষাক খুলে ফেলে সম্পূর্ণ মনোযোগ খোদা তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করেন'।* অতএব খোদা তা'লা যেহেতু আমাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পর চিরস্থায়ী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাই তা থেকে আমাদের কল্যাণমন্ডিত হবার মানসে আমদেরকে খায়রুল কুরুন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যুগকে ধরে রাখার চেষ্টা করে যাওয়া উচিত। প্রজন্ম পরম্পরায় এই প্রেরণা সঞ্চালিত করে যেতে হবে। আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজ খোদা তা'লার সন্তুষ্টিনুসারে হওয়া আবশ্যক। যদি এমনটি না হয় তাহলে আমরা সেই সর্বোত্তম যুগের আকাঙ্খা পোষণকারী হতে পারি না; হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যার উল্লেখ করেছেন। বরং পুনরায় আমরা অন্ধকার যুগে হারিয়ে যাবো, তাই এ উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এরপর তিনি (আ.) আরো বলেন, *'খোদাকে স্মরণের ক্ষেত্রে যেখানে আমার অনুসারীদের একটি বিশেষত্ব থাকবে সেখানে পারস্পরিক প্রীতি ও ভালবাসার ক্ষেত্রেও বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়'।* কেবলমাত্র খোদাকে স্মরণের ক্ষেত্রে নয় বরং জামাতের ভেতর পারস্পরিক সম্পর্কের গন্ডিতে প্রীতি ও ভালবাসার একটি বিশেষ মান থাকা চাই; তিনি (আ.) নিজ অনুসারীদের কাছে এ প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেছেন। এমন অবস্থা যদি সৃষ্টি হয় কেবল তবেই আমরা সেই জামাত হতে পারি যা আখারীনদের জামাত বলে পরিচিত। পারস্পরিক প্রীতি ও ভালবাসার গন্ডিকে তিনি সম্প্রসারিত করে বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেভাবে যদি আমাদের প্রত্যেকেই অধিকার প্রদান আরম্ভ করে তবে কয়েক বছরের মাঝে আমরা এক বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হব।

> *'তোমরা কোন জাগতিক মেলায় আসো নি যে, যতটা লাভবান হবার হলে আর চলে গেলে। বরং এর প্রকৃত কল্যাণে ভূষিত হবার চেষ্টা কর'।*

তিনি (আ.) বলেন, *'মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতার ক্ষেত্রে আমার ধর্ম হল, যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুর জন্য দোয়া না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরী মন পরিস্কার হয় না'।* অতএব দেখুন! আমাদের মাঝে এমন কতজন আছেন যারা এমন ধারণা নিয়ে দোয়ার গন্ডিকে প্রসারিত করে? এমন চিন্তা-চেতনা থাকলে জামাতের ভেতর যে কতক সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা কোন অবস্থাতেই সৃষ্টি হবার কথা নয়।

একজন মু'মিন যদি তার বিরোধী, শত্রু এবং যারা মু'মিন নয় তাদের জন্য দোয়া করে তাহলে আপনজনের ক্ষেত্রে দোয়ায় এক নুতন মাত্রা যোগ হবার কথা আর দোয়ায় একাগ্রতা থাকার কথা। দোয়া যদি এমনভাবে করা হয় আর অন্যের আবেগ-অনুভূতির প্রতি যদি কেউ শ্রদ্ধাশীল হয় তাহলে তাদের প্রতি খোদার স্নেহদৃষ্টি পড়ে। আর যার উপর আল্লাহ্‌র কৃপাদৃষ্টি পড়ে তার ইহ ও পরকাল উভয়ই সুন্দর হয়ে যায়। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ নসীহতকেও আমাদের সর্বদা সামনে রাখতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, *'তোমাদের প্রতি খোদা তা'লার বড়ই অনুগ্রহ, তিনি তোমাদেরকে সেই শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছেন এবং সত্য সনাক্ত করার চোখ দিয়েছেন'।* অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হাতে বয়আত করার তৌফীক দান করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, *'আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ না হলে তোমরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে যারা গালমন্দ করে। যে জিনিসটি তোমাদেরকে এ থেকে বিরত*

রেখেছে তা হল আল্লাহ্ তা'লার কৃপা'। তিনি (আ.) বলেন, ***'এটি মনে করাই যথেষ্ট ভেবো না যে, আমরা মুসলমান। ইসলাম একটি বড় সম্পদ এর মূল্যায়ন কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর'।*** অতএব নামে মুসলমান হওয়া এবং আহমদী হওয়া কোন অর্থ রাখে না আসল কথা হল, ইসলাম ও আহমদীয়াত গ্রহণের আদলে আল্লাহ্ তা'লা যে অনুগ্রহ করেছেন তার মূল্যায়ন করার আবশ্যকতা রয়েছে আর এর মূল্যায়ন কীভাবে হতে পারে? তিনি (আ.) বলেন, ***'এর (ইসলামের) মাঝে যে দর্শন রয়েছে তা কেবল বুলি আওড়ালেই লাভ হয় না। আল্লাহ্ তা'লার সকল শিক্ষার অধীনে জীবন যাপনের নামই হল ইসলাম'।*** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার যতগুলো আদেশ-নিষেধ রয়েছে তা শিরোধার্য করার নামই হল ইসলাম আর এর সারকথা হল, খোদার প্রকৃত ও পরিপূর্ণ আনুগত্য। সে-ই মুসলমান যে নিজের পুরো সত্তাকে খোদা তা'লার সামনে সমর্পন করে। কোন মু'মিন এমন অবস্থায় উপনীত হয় তখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াত,

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থাৎ: প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি খোদা তা'লার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিবে আর সে যদি অনুগ্রহশীল হয় সেক্ষেত্রে তার প্রতিদান তার প্রভু-প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না (সূরা আল্ বাকারা: ১১৩)।

আল্লাহ্ তা'লা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তিই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে খোদার সন্ধানে থাকবে, অন্যান্য সব বিষয়ের উপর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেবে, তার ভয় ও দুঃশ্চিন্তা আল্লাহ্ তা'লা দূর করবেন। 'এহসান' অর্থ হচ্ছে অন্যের সাথে সদ্ব্যবহার করা। এমন ব্যবহার যেখানে কোন ব্যক্তিস্বার্থ থাকে না। নিজ জ্ঞান ও কর্মের মূল লক্ষ্য পুণ্যার্জন, এটি এর আর একটি অর্থ। একজন মানুষের সব কাজ এবং সব জ্ঞান পুণ্যকর্মের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়া আর কোনক্রমেই তার জীবনে পাপের অনুপ্রবেশ না ঘটা, প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে সেই অবস্থা যা অর্জন হলে বলা যায় যে, মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ আছে। অতএব প্রত্যেক আহমদীকে এ অবস্থানে উপনীত হওয়া আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ***'এ অবস্থাই আমাদেরকে প্রকৃত মুসলমান বানায়'।*** অতএব বয়আত করার পর কেবল বয়আত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, একেই সবকিছু মনে করে বসে যাওয়া ঠিক হবে না যে, আমরা আহমদী হয়েছি, বরং নিজেদের মান উন্নত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বয়আত গ্রহণকারীদের সৌভাগ্য সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, ***'আমি সত্যি সত্যি বলছি, এটি এমন এক অনুষ্ঠান যা আল্লাহ্ তা'লা সৌভাগ্যবানদের জন্য নির্ধারণ করেছেন'।*** অর্থাৎ সেসব ব্যক্তিবর্গের জন্য যারা আহমদীয়াতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। ***'সৌভাগ্যবান তারা যারা এখেকে কল্যাণ অন্বেষণ করে। তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছ, তোমরা কখনো এ বিষয়ে গৌরব বোধ করো না যে, তোমাদের যা কিছু পাবার তা পেয়ে গেছ। এটি সত্য যে, তোমরা এসব অস্বীকারকারীদের তুলনায় সৌভাগ্যের অধিক নিকটতর। অর্থাৎ সেই অস্বীকারকারীদের তুলনায় তোমরা সৌভাগ্যের অধিকতর নিকটবর্তী যারা ঘৃণ্য অস্বীকার ও অবমাননা দ্বারা খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করেছে। এটিও সত্য যে, তোমরা সুধারণার বশবর্তী হয়ে খোদা তা'লার ক্রোধ থেকে নিজেদের রক্ষা করার কথা ভেবেছ।***

সত্য কথা হল, তোমরা সেই ঝর্ণার নিকটে পৌঁছেছো যা এখন খোদা তা'লা তাঁর চিরস্থায়ী জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। হ্যাঁ, এখনো পানি পান করা বাকী আছে। অতএব খোদা তা'লার কৃপা ও বদান্যতার দোহাই দিয়ে সৌভাগ্য যাচনা কর– যেন তিনি তোমাদের পরিতৃপ্ত করেন। কেননা খোদাকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই হতে পারে না। খোদা তা'লা না চাইলে কিছুই হতে পারে না। তোমরা পানি পান করতে পারবে না। কেবল আহমদীয়াতভূক্ত হয়েই এখেকে কল্যাণ লাভ করতে পারবে না'। তিনি (আ.) বলেন, ***'আমি জানি নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি এ ঝর্ণা থেকে পান করবে সে কখনো ধ্বংস হবে না। কেননা এ পানি প্রাণপদ এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা করে আর শয়তানের আক্রমন থেকে সুরক্ষিত রাখে। এ প্রস্রবন থেকে পরিতৃপ্ত হবার উপায় কী? উপায় হচ্ছে, খোদা তা'লা তোমাদের জন্য যে দু'টি দায়িত্ব (আল্লাহ্‌র ও বান্দার অধিকার) নির্ধারণ করেছেন তা যথাযথভাবে এবং পূর্ণরূপে প্রদান কর। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে খোদার, অপরটি সৃষ্টির'।***

অতএব এটি হচ্ছে সেই অবস্থা এবং সেই মর্যাদা যা আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের ভেতর সৃষ্টি ও অবলম্বন করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এটিও আমাদের প্রতি একটি বড় অনুগ্রহ যে, অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের উন্নত মানে উপনীত করার জন্য জলসার মত একটি অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছেন যেখানে আমরা পুণ্যের কথা শুনে এবং একে অন্যের পুণ্য প্রভাবে সেই মান অর্জনের প্রতি মনোযোগী হতে পারি যা তিনি (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চেয়েছেন।

অতঃপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তিনি (আ.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, প্রত্যেক আহমদীর সেদিকে গভীরভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত আর তা হচ্ছে, নিজের জ্ঞানগত মানকে উন্নত করা। বর্তমান সমাজে পার্থিব জ্ঞানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ রয়েছে, কিন্তু ধর্ম শিক্ষার প্রতি মনোযোগ কম। তিনি (আ.) বলেন, ***'সত্যিকার পরিবর্তন, তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন'।*** এ ধর্মীয় জ্ঞান বর্তমানে কেবলমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব।

তিনি আমাদের কাছে তাঁর গ্রন্থাবলীর বিশাল ভান্ডার রেখে গেছেন যা জ্ঞান ও নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মনি মুক্তায় সমৃদ্ধ। অতএব এগুলো পাঠের প্রতিও

বিশেষ মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। যারা উর্দু জানে না তাদের উচিত যে সমস্ত পুস্তক ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হয়েছে সেগুলো পড়া। চার পাঁচ খন্ডের আকারে কিছু নির্বাচিত অংশ রয়েছে সেগুলোর প্রতিও দৃষ্টি দিন। যারা উর্দু জানেন তারা উর্দূতে পড়ুন কেননা এগুলো আমাদের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি প্রখর করার অনেক বড় মাধ্যম। কেননা তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তা পবিত্র কুরআনের তফসীর বৈ অন্য কিছু নয়। এ যুগে পবিত্র কুরআনে অন্তর্নিহিত জ্ঞান খোদা তা'লা সবচেয়ে বেশী তাঁকে দান করেছেন। অধিকহারে কুরআন করীম পড়ার ব্যাপারে তিনি (আ.) বলেন, *'আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহে আমার সামনে স্পষ্ট করেছেন, কুরআন শরীফ একটি জীবন্ত ও সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে আমি তাদেরকে বার বার এ বিষয়ের নসিহত করছি, খোদা তালা এই জামাতকে তত্ত্ব ও সত্যের পর্দা উন্মোচনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন কেননা এটি ছাড়া ব্যবহারিক জীবনে কোন জ্যোতি ও আলো সৃষ্টি হয় না'*। কুরআন করীমের জ্ঞান থাকলে পরেই তত্ত্ব ও নিগুঢ় আধ্যাত্মিক রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। এটি ব্যতিরেকে জীবনে কোন ধরনের জ্যোতি, আলো এবং ধর্মীয় জ্ঞান লাভ হতে পারে না। তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, *'আমি চাই কর্মের ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠতার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট হোক। খোদা তালা এই কাজের জন্য আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তাই কুরআন শরীফ অধীকহারে পাঠ কর শুধু কিচ্ছা কাহিনীস্বরূপ নয় বরং দর্শন ভেবে পড়'*।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেহেতু প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার পাশাপাশি তাঁর মান্যকারীদের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণ করেছেন তাই আমাদের দায়িত্ব, আমরাও যেন পবিত্র কুরআনকে বুঝি, পড়ি এবং এর সৌন্দর্য ও অপরূপ বৈশিষ্ট্যকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করি এবং তাদের কাছে পৌঁছাই। বর্তমান যুগে আমাদের কাছে তবলীগের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল, পবিত্র কুরআন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বা পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উঠে আমরা এই অস্ত্র কীভাবে ব্যবহার করব? নতুন প্রজন্মের এ ধরনের কোন হীনমন্যতায় বা কমপ্লেক্সে ভোগার কোন কারণ নেই। এ অস্ত্রের মাধ্যমেই সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ হবে।

অতএব এটি আমাদের শিখতে হবে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছাতে হবে। পবিত্র কুরআন পাঠ করা, বুঝা এবং এর মাধ্যমে আপত্তিকারীদের মুখ বন্ধ করার দায়িত্ব আজ আমাদের উপর ন্যস্ত। এখানে প্রতিনিয়ত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.) সম্পর্কে যে ঘৃণ্য আপত্তি করা হয় এগুলোর অপনোদন করার দায়িত্ব আজ আমাদের। আর এটি কেবল গুটি কতক লোকের কাজ নয়, খোদ্দামুল আহমদীয়ার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন কোন সদস্যের মাধ্যমে বা মজলিস আনসার সুলতানুল কলম গঠন করা হয়েছে– এখন একেই আমরা যথেষ্ট মনে করব। এমন নয়, বরং প্রত্যেক আহমদী নর-নারী, আবালবৃদ্ধবনিতাকে এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত যেন আমাদের প্রত্যেকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচারকারীদের অর্ন্তভূক্ত হতে পারি।

তিনি(আ.) বলেন, *'এই জামাতভূক্ত হয়ে তোমার সত্তা যেন পৃথক হয়ে যায়। তুমি এক নতুন জীবন যাপনকারী মানুষে পরিণত হয়ে যাও, তুমি প্রথমে যেমন ছিলে তেমনই যেন না থাক। এটি মনে করো না, খোদা তা'লার রাস্তায় পরিচালিত হওয়ায় তুমি পরমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে অথবা তোমার অনেক শত্রু সৃষ্টি হবে। না! খোদার আঁচল যে আকড়ে ধরে সে কখনো পরমুখাপেক্ষী হয় না। তার উপর দুর্দিন আপতিত হতে পারে না অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যদি বিপদাপদ আসেও সে এটিকে অনুভবই করে না। বরং সে দিনটি তার জন্য বেহেশ্তের দিন হয়ে থাকে। খোদার ফিরিশ্তা মায়ের মত তাকে কোলে তুলে নেয়। সেই কষ্টের যুগে আল্লাহ্ তা'লার সাথে এক সুগভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে আর এই সম্পর্কের ফলে আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশ্তাকে আদেশ করেন এমন ব্যক্তিবর্গকে নিজের ক্রোড়ে নিয়ে নাও'*।

অতএব এই গুটিকতক বাক্য আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেসব উপদেশাবলী থেকে বর্ণনা করেছি যা তিনি বিভিন্ন সময় আমাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলে গেছেন। আমাদের উচিত, তা মেনে চলার চেষ্টা করা। নিজেদের জীবনে এমন এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করা যার ফলে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি। যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, আমাদের এই জলসা কার্যতঃ আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় এবং জ্ঞানগত উন্নতির জন্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

অতএব জলসার দিনগুলোতে জলসার পরিবেশ এবং এখানকার বক্তৃতা সমূহ থেকে অনেক বেশি লাভবান হবার চেষ্টা করুন আর প্রত্যেকে আত্মজিজ্ঞাসা করুন! আমি কি সেই মান অর্জন করছি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন? কেবল তবেই আমরা সঠিক অর্থে জলসায় অংশ গ্রহণের ফায়েদা হাসিল করতে পারব আর এর বরকত থেকে কল্যাণমন্ডিতও হতে পারব; না হয় এটিও বাহ্যিক মেলার মত একটি মেলাই হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এই উদ্দেশ্য অর্জনের সৌভাগ্যদান করুন।

ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে নিজের গন্ডিতে এবং চারপাশের পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এটি জলসার পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আপনাদের সুরক্ষার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

দেখা যায়, কর্তব্য পালনরত অবস্থায় এমনও অনেকে আছেন যারা নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেয় না। তাই যথারীতি নামাযের ব্যবস্থা হওয়া চাই, কর্মীরা বিশেষভাবে এই নির্দেশ স্মরণ রাখবেন আর যারা নিগরান তারা এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। একইভাবে জলসার সময় যিক্‌রে এলাহীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন; এটি জলসার অনেক বড় একটি উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সা.)-এর দিব্য দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

> **ইসলামের মহা বিজয়ের সংবাদ তিনি (সা.) এভাবে দিয়ে গেছেন 'আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলকে আমার জন্য গুটিয়ে দেখিয়েছেন।' এর তাবীর সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন আমার উম্মত পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে অবশ্যই রাজত্ব লাভ করবে,আর তা আমাকে দিব্যদর্শনে দেখানো হয়েছে।**

আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ অর্থাৎ নবীদের সত্যতার মানদন্ড হিসেবে অদৃশ্যের সংবাদ প্রাপ্তি ও প্রদানকে, তাদের সত্যতার এক অকাট্য প্রমান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿۲۷﴾
اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿۲۸﴾

অর্থাৎ (তিনি) অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত! আর তিনি কাউকে তাঁর অদৃশ্য জগতের কর্তৃত দান করেন না। কেবল তাকে ছাড়া যাকে তিনি (তাঁর) রসূলরূপে মনোনীত করেন। আর তার সামনে ও তার পিছনে (ফিরিস্তারা) প্রহরীরূপে চলছে। (সূরা আল জিন ২৭-২৮)

নবীদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান প্রদানের মাধ্যম সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ
وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ
مَا يَشَآءُ ۭ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿۵۲﴾

অর্থাৎ আর কোন মানুষের এ যোগ্যতা নেই যে আল্লাহ তার সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন, তবে কেবল ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা কোন বার্তাবাহক পাঠানোর মাধ্যমে , যে তার আদেশানুযায়ী তা–ই ওহী করে যা তিনি চান। নিশ্চয় তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাবান (ও) পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা আশ শুরা ৫২) অর্থাৎ নবীগণ ওহী, ইলহাম ,সত্য স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনের মাধ্যমে অদৃশ্যের সংবাদ লাভ করে থাকেন।

আলেমুল গায়ব অর্থাৎ অদৃশ্য ও ভবিতব্য, সব বিষয়াদী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আল্লাহর কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে কেবল নবীগণই মানব জাতির কাছে তা উপস্থাপন করেন।

এ পৃথিবীতে অনেক এমন লোক রয়েছে যারা নবীদের যুগে অথবা তাদের গত হয়ে যাবার পরবর্তি সময়ে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার কথা বলে দাবী করে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মিথ্যা ও ভুল প্রমাণিত হয়। তবে জেনে রাখা আবশ্যক, অদৃশ্য বিষয়ের যে সব জ্ঞান নবীগণকে দেয়া হয়, ঐগুলোর প্রকৃতি, ব্যাপকতা, গভীরতা, গুরুত্ব, বিশ্বস্ততা ও জনকল্যাণ-মুখিতা এবং বিশেষ করে ওহী-ইলহামকে প্রক্ষেপমুক্ত ও অবিকৃত অবস্থায় রাখা ও এর রক্ষা করা ইত্যাদি গুণাবলী এমনি অতুলনীয় যা অন্য সব জ্ঞান হতে স্বতন্ত্র ও অনন্য। ওহী ইলহাম অর্থাৎ অদৃশ্যের সংবাদ দাতা ও এর নিয়ন্ত্রনকর্তা আল্লাহ তা'লা, তাই অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকে তিনি নবীদের সত্যতার মানদন্ড হিসেবে নির্ণয় করেছেন এবং এসবের পূর্ণতার মাধ্যমে নবীদেরকে তিনি শত্রুদের ওপর বিজয় প্রদান করে থাকেন।

সায়্যেদুল আম্বিয়া নবী করীম (সা.)কে আল্লাহ তা'লা ***"বশীর"*** অর্থাৎ ***সুসংবাদ দাতা*** এবং ***"নযীর"*** অর্থাৎ সতর্ককারী উপাধীতে ভূষিত করেছেন। উম্মাতে মুহাম্মদীয়ার সাথে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনাবলী এবং কোন কোন ঘটনার অংশবিশেষ আল্লাহ তা'লা তাঁকে (সা.) সত্য স্বপ্ন ও কাশফের মাধ্যমে এভাবে দেখিয়েছেন যে মানুষ আশ্চার্যান্বিত হয়ে যায় আর ভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর কথাগুলো এভাবে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে পারে!

যেমন একবার কসুফের নামাযের মধ্যে মহানবী (সা.)কে দিব্যদর্শনে একটি দৃশ্য দেখানো হয়। নামাযের পর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, নামাযের মধ্যে আপনি একবার এগিয়ে গেলেন আরেকবার পিছনে আসলেন এর কারন কি? তিনি (সা.)

বললেন, নামাযের মধ্যে আমাকে এখানে ভবিষ্যতের সে সব দৃশ্য দেখানো হয়েছে যা সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এমন কি, আমাকে দোযখ ও জান্নাতও দেখানো হয়েছে। এ দিব্যদর্শন এতো স্বচ্ছ ও বাস্তব ছিল, জান্নাতের নেয়ামত সমূহ থেকে কিছু নেয়ার জন্য তিনি (সা.) এগিয়ে যান এবং জাহান্নামের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে তিনি পিছিয়ে যান। (বুখারী, কিতাবুত কুসুফ)

মহানবী (সা.) এর অনেক রুইয়া ও কুশূফ হাদীসের গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। এ সব বিষয়ের বর্ণনা পড়লে বিভিন্ন ঘটনার বিবরন জানা যায়। তাঁর এ সব রুইয়া ও কূশুফকে কয়েকভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কিছু, যা তাঁর (সা.) জীবনে হুবহু পূর্ণতা লাভ করেছে। কিছু রুইয়া ও কশুফ তাঁর (সা.) জীবনে তাবীরী অর্থাৎ ব্যাখ্যা মূলক অর্থে পূর্ণ হয়েছে। কিছু রুইয়া ও কুশুফ তাবীরী সুপ্ত-অর্থে প্রকাশিত যা পূর্ণ হবার পর মহানবী (সা.) এর অর্থ বুঝতে পেরেছেন, নতুবা তাবীরী অর্থ প্রকাশিত হবার পূর্বে তিনি (সা.) এর অর্থ ভিন্ন কিছু বুঝেছিলেন। আর কিছু রুইয়া ও কুশুফ যা তিনি দেখে তাঁর (সা.) উম্মতকে অবগত করে গেছেন যা তাঁর মৃত্যূর পর প্রকাশিত হয়েছে বা হবে বা হতে থাকবে। তা থেকে এখানে কয়েকটি লিপিবদ্ধ করছি।

অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ও সত্য স্বপ্ন মহানবী (সা.) এর জীবনে হুবহু অর্থাৎ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) এর সাথে তার বিবাহ। বিয়ের পূর্বেই হযরত আয়েশা (রা.) এর ছবি দেখিয়ে বলা হয়েছে ইনি হলেন তোমার স্ত্রী। এ সত্তেও তিনি (সা.) এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলেন এবং বললেন এ রুইয়া যদি বাস্তবেই পূর্ণ হবার থাকে তবে আল্লাহ তা'লা স্বয়ং এর ব্যবস্থা করে দিবেন। (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ)। পরবর্তিতে প্রতিকুল অবস্থা সৃষ্টি হওয়া সত্তেও এ বিয়ে সম্পন্ন হয়।

মহানবী (সা.) এর কিছু ভবিষ্যদ্বানী ও রুইয়া এমন ছিল যা তাঁর (সা.) জীবদ্দশায় পূর্ণ হয়েছিল, তবে তা বাহ্যিকভাবে হুবহু পূর্ণতা লাভ করেনি বরং তা 'তাবীর' রূপে অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক অর্থে পূর্ণতা লাভ করেছে। এরূপ অনেক ভবিষ্যদ্বানী ও রুইয়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন উহদ যুদ্ধের পূর্বে মহানবী (সা.) দিব্যদর্শনে কয়েকটি গাভী জবাই করার দৃশ্য দেখেন, নিজে তরবারী চালাচ্ছেন এবং এই তরবারীর অগ্রভাগ ভেঙ্গে যাওয়ার দৃশ্য দেখেছেন। (বুখারী, কিতাবুত তাবীর) মহানবী (সা.) এর এ দিব্যদর্শন উহদের যুদ্ধে সত্তর জন মুসলমানের শাহাদত লাভ, মহানবী (সা.) এর দাঁত শহীদ হওয়া এবং তাঁর আহত হবার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে।

মহানবী (সা.) কিছু রুইয়া ও কশুফ এমন রয়েছে যে সবের তাবীর তিনি (সা.) যা মনে করেছিলেন পরবর্তিতে তা ভিন্নতর রূপে তাঁর জীবনে পূর্ণতা লাভ করেছে । যেমন মহানবী (সা.)কে কাশফে খেজুর গাছ বিশিষ্ট স্থানকে দারুল হিজরত রূপে দেখানো হয়েছে। তিনি (সা.) এর অর্থ করেছিলেন ইয়ামামা। পরবর্তিতে তা মদীনা রূপে প্রমাণিত হলো। (বুখারী, কিতাবুত তাবীর)

মহানবী (সা.) এর কিছু রুইয়া, যা প্রাথমিক ভাবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে হয়েছে, কিন্তু তিনি (সা.) পরবর্তিতে বুঝতে পারলেন এ রুইয়া তাঁর (সা.) মৃত্যূর পর প্রকাশিত হবে। তখন তিনি (সা.) তদনুযায়ী এ সব ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর (সা.) উম্মতকে জানালেন। তাঁর (সা.) মৃত্যুর পর এ ভবিষ্যদ্বাণী তা পূর্ণতা লাভ করে। যেমন মহানবী (সা.) বলেন 'আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার হাতে সোনার দুটি কা'কন আর আমি তা অপছন্দ করে কেটে ফেললাম। এর পর আমাকে আদেশ দেয়া হলো আর আমি এ দুটিতে ফুঁ দিলাম আর সে দুটি উড়ে গেলো। আমি এর তাবীর করলাম দু জন মিথ্যাবাদী আমার পর প্রকাশিত হবে।' উবেয়দুল্লাহ বলেন এর দ্বারা আসওয়াদ আনসি এবং মুসেয়লেমা কাজ্জাব কে বুঝানো হয়েছে। (বুখারি, কিতাবুল মাগাযি ওয়া কিতাবুত তাবীর)।

একবার মহানবী (সা.) বললেন 'আমাকে পৃথিবীর সম্পদের চাবি দেয়া হয়েছে। এমনকি সেগুলোকে আমি আমার কাছে রেখেছি।' হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন নবী করীম (সা.) এর মৃত্যুর পর আমরা ঐ সম্পদ গুলো অর্জন করছি। (বুখারি কিতাবুত তাবীর)

মহানবী (সা.) এর কিছু কাশফ ও রুইয়া এমন রয়েছে যা আখেরী যামানার সাথে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে কিছু সতর্ককারী সংবাদ এবং সুসংবাদ রয়েছে। মহানবী (সা.) কে এগুলোর তাবীর সম্পর্কে জ্ঞাত করা হয়নি এবং তিনি (সা.) নিজেও এর তাবীর বর্ণনা করেন নি। তবে পরবর্তি যুগে এসব ভবিষ্যদ্বাণীর তাবীর প্রকাশিত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার সত্যতা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। যেমন মহানবী (সা.) রুইয়াতে মসীহ মাওউদ এবং দাজ্জালকে কাবা গৃহ তাওয়াফ করতে দেখেছেন। (বুখারী কিতাবুত তাবীর)

অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে দাজ্জাল মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেনা। এজন্য উম্মতের আলেমগন এই কাশফের তাবীর এই করেছেন , দাজ্জালের কাবা গৃহের তাওয়াফ করার অর্থ হলো ইসলামের ক্ষতি সাধন ও ধ্বংস করার চেস্টা করা। আর মসীহ মওউদ (আ.) কাবা গৃহের তাওয়াফ করার অর্থ হলো কাবা গৃহ ও ইসলামের সুরক্ষা বিধান করা। (মাযাহেরুল হাক্কে, শারাহ মিশকাতুল মাসাবিহ, চতুর্থ খন্ড, ৩৫৯ পৃ)

সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ এবং ইমাম মাহদী (আ.) দ্বারা ইসলামের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের যে সুসংবাদ মহানবী (সা.) দিয়ে গিয়েছিলেন আজ তা আহমদীয়া মুসলিম জামাত দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। আর কাবা গৃহের নিরাপত্তা, তাও আজ আমদীয়া মুসলিম জামাতের হৃদয় নিংড়ানো দোয়া দ্বারা হচ্ছে।

মহানবী (সা.)কে তাঁর উম্মতের আধিক্য, মর্যাদা ও প্রাচুর্যের দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, আমার উম্মতের আধিক্য দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তাদের দ্বারা (হাশরের) ময়দান ভরে গেছে। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, প্রথম খন্ড ৩-৮ পৃ)

মহানবী (সা.) উম্মতের এমন সৌভাগ্যবানদের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন যারা হিন্দুস্তানে জিহাদ করবে এবং আরো এক দলের কথা তিনি (সা.) আমাদের জানিয়েছেন যারা মসীহ মাওউদ এর সঙ্গী হবে। (নিসাই, কিতাবুল জিহাদ)

এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথমাংশ ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মদ বিন কাশেম এর মাধ্যমে সিন্ধু প্রদেশের বিজয় দ্বারা উপমহাদেশে ইসলামের বিজয়যাত্রা শুরু হয়। তিনি সিন্ধুর অত্যাচারী রাজার হাত থেকে সেখানকার লোকদেরকে উদ্ধার করেন এবং সেখানে শান্তি এবং ন্যায়-শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তার উত্তম ব্যবহারে এবং উত্তম আচরনের কারনে সেখানকার অধিবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে।

এ ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশের সম্পর্ক হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগের সাথে। সেযুগে সৌভাগ্যবানদের এক দল

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর নেতৃত্বে ধর্মের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও জান-মালের কুরবানী দিবে। তাদের প্রতি মহানবী (সা.) নিজ ভালোবাসা প্রকাশ করে তাদেরকে নিজের ভাই বলে সম্বোধন করেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, দ্বিতীয় খন্ড, ৩০০ পৃ) এক রেওয়াআতে বর্ণিত হয়েছে 'তারা আমাকে দেখেছে এবং আমার ভালোবাসায় তারা বড় বড় ত্যাগ করবে। (মসনাদে দারেমী, কিতাবুর রিকাক)।

তিনি (সা.) আরো জানিয়েছেন, 'মসীহ মাওউদের যামানায় আল্লাহ তাআলা ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মের অসারতা প্রমাণ করে দিবেন এবং অন্যান্য ধর্মিয় গোষ্ঠিকে মিটিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম)

ইসলামের মহা বিজয়ের সংবাদ তিনি (সা.) এভাবে দিয়ে গেছেন ' আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলকে আমার জন্য গুটিয়ে দেখিয়েছেন।' এর তাবীর সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন আমার উম্মত পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে অবশ্যই রাজত্ব লাভ করবে,আর তা আমাকে দিব্যদর্শনে দেখানো হয়েছে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান)

আগামীতে এ ভবিষ্যদ্বাণী কি রূপে পূর্ণ হবার ছিল সে দৃশ্য আল্লাহ তাআলা মহা নবী (সা.) কে খন্দকের যুদ্ধে দেখিয়েছিলেন। সাহাবারা সবাই ক্ষুধার্ত। খাদ্য নেই । সে সময় মহানবী (সা.) এর পেটে তিনটি পাথর বাঁধা। কাফের ও মুনাফেকদের 'মরণ কামড়' এর মুকাবেলায় মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলছিলেন। সবাই ক্লান্ত । সে সময় একটি বড় পাথর ভাঙ্গতে অপারগ হয়ে সাহাবায়েকেরাম মহানবী (সা.) এর শরনাপন্ন হন। তিনি (সা.) বললেন, এর ওপর পানি ফেল। এর পর মহানবী (সা.) কোদাল দিয়ে আঘাত করেন, পাথরের একাংশ ভেঙ্গে গেল। মহানবী (সা.) উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বললেন।

তিনি (সা.) বললেন সিরিয়ার চাবি আমার হাতে দেয়া হয়েছে, খোদার কসম! সিরিয়ার লাল রংয়ের প্রাসাদসমূহ আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। এর পর দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন, পাথরের আরেকাংশ ভেঙ্গে গেল। তিনি (সা.) উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বললেন আর সাহাবাদের জানালেন, ইরানের চাবি আমার হাতে দেয়া হয়েছে এবং আমি মাদায়েনের সাদা রংয়ের প্রাসাদ সমূহ এখান থেকে আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি (সা.) তৃতীয়বার পাথরটির ওপর আঘাত করলেন আর পাথরটি টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তিনি (সা.) পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বললেন। সাহাবীদের বললেন ইয়ামানের চাবি আমাকে দেয়া হয়েছে। খোদর কসম সানা শহরের প্রাসাদ সমূহ আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল দ্বিতীয় খন্ড , ৩০৩ পৃ)

এ এক মহান আধ্যাত্মিক দিব্যদর্শন ছিল। একদিকে শত্রু পরিবেষ্ঠিত, খাদ্যাভাবে পেটে পাথর বাধা এবং জীবন সংকটাপন্ন, সে সময়ে ঐশী অঙ্গীকার অনুযায়ী সাহাবীদেরকে মহান আল্লাহ্ তাআলা দু'টি সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হবার সু-সংবাদ দিচ্ছেন। আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস রাখলে পরই এমনটি হওয়া সম্ভব।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং হযরত আবূ উবায়দা (রা.) এর দ্বারা ইসলামী সেনাদল সিরিয়া বিজয় করে। হযরত ওমর (রা.)এর যুগে এ বিজয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। হযরত সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস এর নেতৃত্বে ইরান মুসলমানদের করতলগত হয়। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের দুটি শক্তিধর সাম্রাজ্য রোম ও ইরান মুসলমানদের হস্তগত হয়।

মুসলমানদের চরম নির্যাতন ও বিপদের সময় মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকে আশ্বস্ত করে বলেছেন ' তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে যখন ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ইমাম হবেন। (বুখারী, বাব নযূলে ঈসা) তিনি (সা.) বলেগেছেন, মাহদী ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে অপর কেউ নন। (ইবনে মাজা, বাবু শিদ্দাতুয যামান)

আজ আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার চরম বিপদ ও অধপতনের এই যুগে মহানবী (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)কে ঈসা সদৃশ করে পাঠিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর (আ.) জামাত দ্বারা অন্যান্য ধর্মাবলীর উপর ইসলামের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছেন। মহানবী (সা.) বলে গেছেন 'যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে তাঁর হাতে বয়আত কর, যদি বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর খলীফা আল মাহদী। (সুনানে ইবনে মাজা, বাবু খরুজুল মাহদী)

মহানবী (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আজ সারা বিশ্বে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)এর জামাত, মহানবী (সা.) এর পতাকা উত্তোলিত করে চলেছে তথা ইসলামের বাণী প্রচার করে চলছে আর অপর দিকে যাদের কাছে তিনি (সা.) এসেছেন তারা তাঁকে কাফের আখ্যা দিয়ে বিরোধীতা করে চলেছে এবং মুখের ফুঁৎকার দিয়ে ঐশী এ প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে চাইছে। তবে এরূপ হওয়া কখনও সম্ভব নয়, কেননা এতো আল্লাহর প্রতিশ্রুতি।

ভাববার বিষয় হলো, মহানবী (সা.) এর প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। তবে কিছু তাঁর জীবদ্দশায়, কিছু তাঁর (সা.) মৃত্যুর অব্যবহতি পর এবং কিছু তাঁর মৃত্যুর বহুবছর পর। এছাড়াও তাঁর (সা.) অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা বিভিন্ন ভাবে পূর্ণ হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকবে। কোনটি তাবীরের দিক থেকে কোনটি আক্ষরিক অর্থে আবার কোনটি পূর্ণ হবার পর জানা যাচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণীটি এ ভাবে পূর্ণ হবার ছিল।

হযরত ঈসা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটিও পূর্ণ হবার ছিল, তবে হ্যাঁ, কেউ যদি হযরত ঈসা(আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি, ইহুদীদের এলিয়া নবীর আগমনের মত আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হবে বলে বিশ্বাস করে, তবে তা কখনো পূর্ণ হবে না, কেননা সেভাবে ইহুদীদের জন্যও তা পূর্ণ হয়নি। এলিআ আসলেন এবং তাদের জানালেন ভবিষ্যদ্বাণীটি আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হবার ছিলনা বরং তা রূপক অর্থে পূর্ণ হবার ছিল কিন্তু ইহুদীরা তা মানলনা এবং তারা অভিশপ্ত হয়ে গেল। কুরআন প্রতিদিন সূর ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আমাদেরকে স্মরণ করায় 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মাগযুবের পথে নিওনা"। অর্থাৎ ইহুদীদের পথে যেতে দিও না। তাই উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার দায়িত্ব হলো হৃদয়ের চোখ খুলে মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পড়া এবং তারপর হযরত ঈসা(আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী গুলি পড়া । এরপর অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করা। তবেই এ বিষয়টি সু-স্পষ্ট হয়ে যাবে, হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে যা ভাবা হচ্ছে আসলে তা নয়। হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী আসলে রূপক অর্থে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে মহানবী (সা.) এর প্রতিটি আদেশ, বুঝার তৌফিক দিন এবং এর উপর আমল করার যোগ্যতা দান করুন। আমীন!

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১লা জানুয়ারী

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

বিশ্ব-মুসলিম নেতার ভাষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে কাদিয়ানে আহমদীয়া মুসলিম বার্ষিক সম্মেলন সমাপ্ত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মহান মর্যাদা রক্ষায় নিয়োজিত থাকা সকল খাঁটি মুসলমানদের সারাজীবনের কর্ম

ভারতের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ১২১তম বার্ষিক-সম্মেলন (জলসা সালানা) গতকাল কাদিয়ানে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবের বলিষ্ঠ ও ঈমান-বর্ধক এক ভাষণ প্রদানের মাধ্যমে শেষ হয়।

খলীফা সাহেব লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ থেকে ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য রাখেন। জলসাটি সারা বিশ্বের ১৮,০০০ এর অধিক মানুষকে কাদিয়ানে আকর্ষণ করে, আর ৪,০০০ এরও বেশী লোক এই সমাপ্তি-অধিবেশনের জন্যে লন্ডনে সমবেত হয়।

এক ঘন্টাব্যাপী তাঁর এই বক্তৃতায় হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব আন্তরিক ও যথাযথ-পন্থায় পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) এর সম্মান রক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত এক বক্তব্য প্রদান করেন।

পাকিস্তানের কতিপয় তথাকথিত ধর্মীয়-আলেম কর্তৃক '*২০১৩-কে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) এর সম্মান রক্ষার সন* হিসেবে ঘোষণার খবরের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, ***এই মহৎ কর্মের জন্যে মাত্র এই এক বছর সময়কে মনোনীত করাটা হচ্ছে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সত্যটি হলো, এসব আলেম পবিত্র নবী (সা.) এর প্রতি তাদের ভালবাসায় আন্তরিক নয়, বরং কেবল লোভ ও ক্ষমতা দ্বারা প্ররোচিত।***

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বলেন : 'তথাকথিত এই ধর্ম-যাজকেরা এবং তাদের অনুসারীরা কেবলই তাদের নিজস্ব

কায়েমী-স্বার্থ চরিতার্থ এবং তাদের অহংকে পরিতৃপ্ত করার আকাঙ্খা পোষণ করে। ধর্মের নামে তারা নিরীহ ও অরক্ষিত লোকদের রক্ত শুষে নিচ্ছে। এটা কতই না অন্যায় যে, তারা সেই মহান নবীর নামে এ-ধরনের জঘন্য কর্মাদি করছে, যিনি সমগ্র বিশ্বের জন্যে ক্ষমা ও করুণার উৎস হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন'।

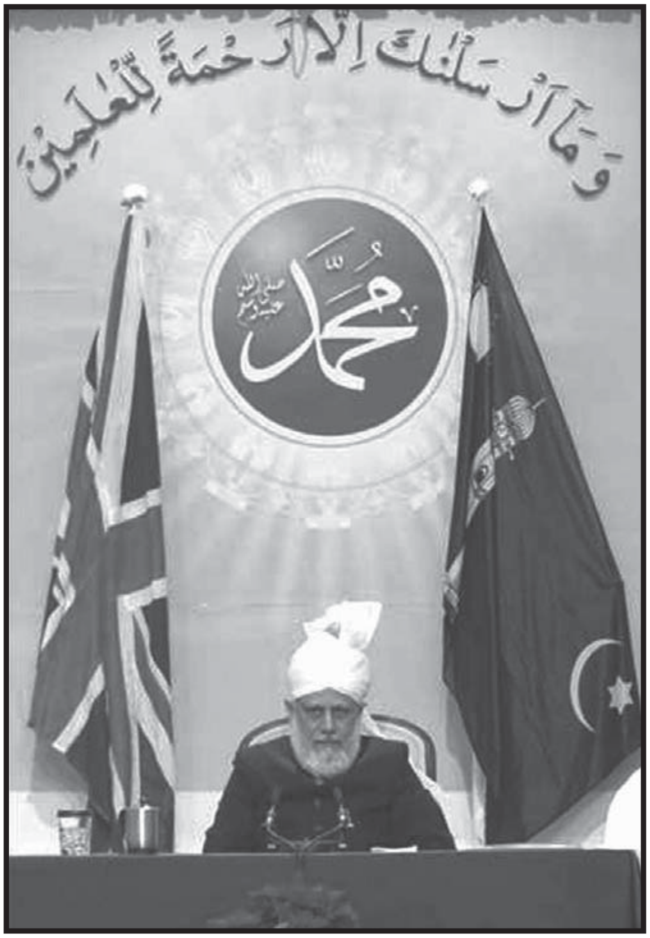

খলীফা সাহেব বর্ণনা করেন যে, নিরীহ লোকদের ওপর চালিত সব আক্রমণ নিন্দার্হ এবং ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষাসমূহের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, অমুসলিমদের অধিকারসমূহে যারা হস্তক্ষেপ করছে অথবা এক পীড়াদায়ক কায়দায় কাজ করছে, তারা ইসলামের মৌলিক-শিক্ষাকে অমান্য করছে। খলীফা সাহেব সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, এ ধরণের লোকেরা নিজেদের ওপর খোদার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

অধিকন্তু, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব এ দিকনির্দেশও দান করেন যে, সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা অথবা অবিচারের মাধ্যমে নয়, বরং ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ-শিক্ষাসমূহের অনুসরণের মাধ্যমেই খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

খলীফা সাহেব বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ হলেন পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) এর সর্বোত্তম গোলাম।

হুযূর (আই.) বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) অতুলনীয় গভীর-প্রজ্ঞা ও ধীশক্তি এবং স্পষ্টতার সাথে খোদার বিশ্বজনীন ও পূর্ণতা-প্রাপ্ত নবী হিসেবে পবিত্র নবী (সা.) এর প্রকৃত-মর্যাদা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এ শিক্ষার কারণেই আহমদী মুসলমানগণ বিশ্বব্যাপী প্রকৃত ইসলামের প্রচার করতে সক্ষম হচ্ছে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বলেন : "গ্রাম, শহর ও নগরগুলোয় এবং সমগ্র-বিশ্বে কেবল আহমদীয়া মুসলমানরাই হচ্ছে সে সব লোক, যারা ইসলাম ও এর পবিত্র নবী (সা.) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ এমন পন্থায় খন্ডন করে চলছে যে, অমুসলমানগণ এটা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, ইসলামকে ভয় করে তারা ভুল করেছে। বস্তুতঃ আমার বিভিন্ন সফরে আমি লক্ষ্য করেছি যে, যাবতীয় সন্দেহ ও অবিশ্বাস অপসারিত হচ্ছে"।

বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলমানদেরকে আবেগজড়িত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। হুযূর (আই.) বলেন : "হে মুহাম্মদের মসীহ্‌র অনুসারীগণ, পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি আপনাদের ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা দিয়ে ২০১২-র শেষ রাতকে আপনারা আলোকিত করুন।

এই তেজকে একটি মাত্র রাতের মাঝে সীমিত করবেন না, বরং এই আলোকে প্রত্যেক বছর প্রত্যেক দিন, প্রজ্জলিত রাখুন, যতক্ষণ না আপনারা শেষ-নি:শ্বাস ত্যাগ করছেন, অথবা সেদিন পর্যন্ত, যতদিন না সমগ্র বিশ্বই পবিত্র নবী (সা.) এর পতাকার নিচে আসছে"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন : "প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের উচিত, এমন আন্তরিক প্রার্থনা ও ইবাদতের মাধ্যমে এ বছরটিকে বিদায় এবং নূতন বছরকে স্বাগত জানানো যে, তাতে আকাশসমূহ আন্দোলিত হয়। আপনাদের বিগলিত অন্তরগুলো আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করুন, যাতে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ বার্তাটিকে আলিঙ্গন করতে সমগ্র বিশ্বই ছুটে আসে"।

– প্রেস সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ইন্টারন্যাশনাল

অনুবাদ: *মোহাম্মদ ফজলুর রহমান*

জলসা সালানায় যোগদানের গুরুত্ব

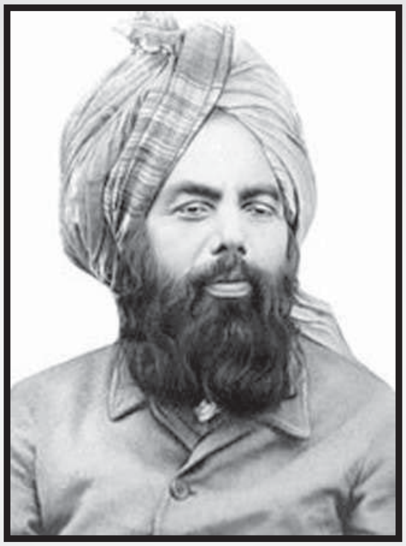

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী
(১৮৩৫-১৯০৮)

সালানা জলসার গুরুত্ব ও মহান উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বহুবিধ কল্যাণময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সমন্বিত এই জলসার পথ খরচের সামর্থ যারা রাখেন এইরূপ সকল ব্যক্তিরই যোগদান করা আবশ্যকীয়। তারা যেন প্রয়োজনীয় বিছানা-পত্র ইত্যাদিও সঙ্গে আনেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সন্তুষ্টি লাভের) পথে সামান্য সামান্য বাধা-বিপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। খোদা তাআলা মুখলেস (খাঁটি ও সরল) ব্যক্তিগণকে, পদে পদে সওয়াব প্রদান করে থাকেন এবং তাঁর পথে কোন পরিশ্রম বা কষ্ট বৃথা যায় না।

পুন: লিখছি যে, এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করবেন না। এটা সেই বিষয়, যার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির ওপর স্থাপিত। এর ভিত্তি আল্লাহ্ তাআলা নিজ হাতে রেখেছেন এবং এর জন্য জাতিবর্গকে প্রস্তুত করেছেন যারা অচিরেই এসে যোগদান করবে। কেননা এটা সেই সর্বশক্তিমান খোদার কার্য যাঁর সম্মুখে কোন কিছু অসম্ভব নয়।

জলসার উদ্দেশ্যাবলী ঃ

(১) এই জলসার একটি মহৎ উদ্দেশ্য এটাও যে, প্রত্যেক মুখলেস (নিষ্ঠাবান) যেন প্রত্যক্ষভাবে দ্বীনি কল্যাণ লাভের সুযোগ পান এবং তার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয় এবং ঈমান ও মা'রেফতে সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে।

(২) একমাত্র জ্ঞান-সঞ্চার ও ইসলামের সাহায্যকল্পে পারস্পরিক পরামর্শ এবং ভ্রাতৃত্ব-মিলনের উদ্দেশ্যেই এই (মহতী) জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হয়েছে।

জলসায় যোগদানকারীদের জন্য বিশেষ দোয়া ঃ

অবশেষে আমি দোয়া করছি, আল্লাহ তাআলা যেন এই লিল্লাহী (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে অনুষ্ঠিতব্য) জলসার উদ্দেশ্যে সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হোন, তাদেরকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করেন, সকল বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট এবং উদ্বেগজনক অবস্থা তাদের জন্য সহজ করে দেন, তাদের সকল দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করেন, তাদেরকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করেন, তাদের সকল শুভ কামনা পূরণের পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করেন ও পরকালে তাদেরকে সেই সব বান্দার সাথে উত্থিত করেন যাদের ওপর তাঁর বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বিরাজ করে এবং তাদের সফরকালীন অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন।

হে খোদা! হে মর্যাদা ও বদান্যতার আধার! করুণা কর ও বাধা-বিপত্তি নিরসনকারী! এই দোয়াসমূহ কবুল কর এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে বিজয় দান করো। কেননা, সকল প্রকার শক্তি ও ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী তুমিই । আমীন! পুন: আমীন!!

(ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর, ১৮৯২ ইং)

মানবতার কল্যাণে মহানবী (সা.)-এর সুমহান শিক্ষা ও আদর্শ

মুহাম্মদ খলীলুর রহমান

পবিত্র কুরআনের আলোকে ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান শিক্ষা এবং আদর্শ বিশ্ববাসীর সার্বিক কল্যাণ এবং মানবতার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য ঐশী-নির্দেশিত এরূপ এক পথ ও পন্থা যার অনুকরণ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সত্যিকার অর্থে ন্যায়-বিচার এবং কাঙ্খিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং মহানবী (সা.) কে *'রহমাতুল্লিল আলামীন'* অর্থাৎ *'বিশ্বের কল্যাণ রূপে'* আখ্যায়িত করেছেন (সূরা আম্বিয়া)। তাই বর্তমান যুগেও এবং ভবিষ্যতে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য সেই সকল সুমহান শিক্ষা ও আদর্শের রূপরেখা সম্পর্কে আমাদের সকলের ভালভাবে জানা প্রয়োজন এবং বিশ্ববাসীকে সম্যকভাবে জানানো প্রয়োজন। বিষয়টি বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, বর্তমান যুগই মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের যুগ যখন পৃথিবীময় মানবতার সার্বিক কল্যাণের নিশ্চয়তা এবং সত্যের মহা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে (সূরা জুমুআ : ৪ এবং এতদসংক্রান্ত বুখারী শরীফের হাদীস–এবং সূরা সাফ : ১০ দ্রষ্টব্য)।

বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীর মহা সংকটময় বিশ্ব-পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দু:খ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহ কতকগুলো সংকীর্ণ স্বার্থ এবং বস্তুবাদীতার জটাজালে এমন ভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে যে, পৃথিবীর কোনে কোনে অগণিত লোক বঞ্চিত নিপীড়িত এবং মর্যাদাহীন জীবন-যাপন করছে, মৌলিক চাহিদা এবং অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণাবলী নিরবে-নিভৃতে কাঁদছে। দেশে দেশে অগণিত লোক চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয়-স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। দরিদ্র, দুর্বল, অসহায় মানুষের উপর অমানসিক নির্যাতন চলছে। বর্ণবাদ, বৈষম্যবাদ এবং শ্রেণী-বৈষ্যমের লেলিহান শিখায় মানবতা আজ জ্বলছে। অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিষ্ঠুর এবং নির্মম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নারী-নির্যাতন অনাথ-এতীম ও অসহায় শিশুদের চরম দুর্দশা এবং অপব্যবহার, কৃষ্টি ও কালচারের নামে নৈতিকতার চরম অধ:পতন। কোন কোন অঞ্চলে সীমাহীন দুর্নীতি এবং দু:শাসন, বংশগত রাজতন্ত্র, রাজনৈতিক কলহ-কোন্দলের ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক উন্নয়ন ও বিকাশ হচ্ছে বাধাগ্রস্থ, স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবী হচ্ছে চরমভাবে অবহেলিত। একদিকে মৌলিক চাহিদার অভাবে ভুগছে অনুন্নত অঞ্চলের অগণিত মানুষ, অন্যদিকে কল্পনাতীত প্রাচুর্যের যুপকাষ্ঠে নৈতিকতা এবং মানবতাকে দিতে হচ্ছে চরম মূল্য। পৃথিবী আজ *গগ্ ও মেগগ্ তথা ইয়াজুজ ও মাজুজের* পরাশক্তির অধীনে জোটভুক্ত হয়ে চলছে এবং সেই সঙ্গে আকাশে বাতাসে অনুরণিত হচ্ছে দানবীয় মারণাস্ত্রের দাপট, আঞ্চলিক যুদ্ধের কোলাহল ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবী-পৃষ্ঠে, মহাকাশব্যাপী পরিব্যাপ্ত বিভিষীকাময় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পাঁয়তারা প্রতিভাত হচ্ছে।

ইসলামের মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শের পুন:প্রয়োগের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে বর্তমান বিশ্বের জটিল সমস্যাবলীর সমাধান এবং মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। পবিত্র কুরআন সার্বিকভাবে অধিকারসমূহকে দুইভাগে ভাগ করেছে। (ক) 'হাকুকুল্লাহ্' (আল্লাহ্-র অধিকার) এবং (খ) 'হুকুকুল ইবাদ' (মানুষের অধিকার)। পবিত্র কুরআনে এই দু'টি বিষয়ের সংগে সম্পৃক্ত বিষয়াদির নীতিগত দিক সমূহের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে এবং হযরত নবী করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শের দ্বারা সেগুলির বাস্তব-দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। তাই একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র একত্ববাদ তথা তৌহিদ এবং ইসলামী 'ইবাদত' সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আদর্শ স্থাপিত হয়েছে, তেমনিভাবে অন্যদিকে মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক, মৌলিক-অধিকার এবং দায়িত্বাবলী সম্পর্কেও ইসলাম পরিপূর্ণ শিক্ষা পেশ করেছে।

আজ হতে চৌদ্দশত বছর পূর্বে 'বিশ্বের কল্যাণ' হিসেবে আবির্ভূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বমানবের মৌলিক-অধিকার সমূহের সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে সেগুলো সংরক্ষণও করেছেন এবং ইসলামী খেলাফত-ব্যবস্থার মাধ্যমে সেগুলির অব্যাহত-নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। মানবজাতিকে পূর্ণরূপে পথ-প্রদর্শনের সার্বিক লক্ষ্যে এবং সকল নবী-রসূলের আবির্ভাবের মহান উদ্দেশ্যোবলী পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে *'খাতামান নবীঈন'* বলে ঘোষণা করেছেন (সূরা আহযাব : ৪১)। অন্যদিকে বিশ্বের সকল বঞ্চিত, দুর্দশা-পীড়িত, আর্তনিপীড়িত মানুষের সার্বিক কল্যাণ এবং মর্যাদাপূর্ণ বাঁচার অধিকার প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে *'রহমতুল্লিল আলামীন'* তথা বিশ্ব কল্যাণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই এ মহামানবের আবির্ভাবে আমরা উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারি ***"খাতামান নবীঈন –যিন্দাবাদ, ইনসানিয়াত – যিন্দাবাদ"।***

১। জীবন ধারণ ও বাঁচার মৌলিক অধিকার :

মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য তার জীবন ধারণ ও বাঁচার মৌলিক-অধিকার, স্বাধীনতা এবং জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হলো, সকল মানুষের জীবনের গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে এবং বিশেষ মহান উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে (সূরা মু'মিন : ১১৬, যারিয়াত : ৫৭)। সকল সৃষ্ট জীবের

আজ হতে চৌদ্দশত বছর পূর্বে 'বিশ্বের কল্যাণ' হিসেবে আবির্ভূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বমানবের মৌলিক-অধিকার সমূহের সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে সেগুলো সংরক্ষণও করেছেন এবং ইসলামী খেলাফত-ব্যবস্থার মাধ্যমে সেগুলির অব্যাহত-নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। মানবজাতিকে পূর্ণরূপে পথ-প্রদর্শনের সার্বিক লক্ষ্যে এবং সকল নবী-রসূলের আবির্ভাবের মহান উদ্দেশ্যোবলী পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে 'খাতামান নবীঈন' বলে ঘোষণা করেছেন।

মধ্যে উৎকৃষ্টতম উপাদানে তাকে তৈরী করা হয়েছে এবং সে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা দ্বারা ভূষিত হয়েছে (সূরা ত্বীন, বনী ইসরাঈল : ৭১) আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধি বা খলীফা হিসেবে ঐশীগুণাবলীর প্রতিফলনের জন্যই মানব–জীবন (সূরা ফাতির : ৪০)।

দারিদ্র্যের ভয়ে নিজ সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, শরীয়ত ও আইন-সঙ্গত কারণ ব্যতীত মানুষকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হয়েছে, কেননা মানুষের জীবন এবং বাঁচার অধিকার রয়েছে। (সূরা আন'আম ১৫২, বনী ইসরাঈল ৩২)।

বিদায় হজ্জের ভাষণে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছেন : মনে রেখো, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মানকে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন।" (বুখারী)

২। অনাথ এবং এতিমদের মৌলিক অধিকার :

অনাথ-এতীমদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো এই যে, তাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে, তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃ সুলভ ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের প্রতি বিশেষভাবে দয়া এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে (সূরা বাকারা : ২২১, ফজর : ১৮-২০, মাউন)।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন : "যে বাড়িতে এতীমদের সংগে সদ্ব্যবহার করা হয়, সেটা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উত্তম বাড়ী এবং যে বাড়ীতে এতীমদের সংগে দুর্ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে সর্বপেক্ষা নিকৃষ্ট বাড়ী" (ইবনে মাজাহ্)।

৩। দাসত্ব এবং দাস-ব্যবসার অবলুপ্তি :

ইসলামই সর্বপ্রথম প্রচলিত দাস-প্রথাকে উচ্ছেদের ঘোষণা করেছে এবং ক্রীতদাস-ব্যবসার অবলুপ্তির জন্য বাস্তাবানুগ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো এই যে, নিয়মিত-যুদ্ধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দাস হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না এবং নিয়মানুযায়ী 'মুক্তিপণ' আদায় করার পর যুদ্ধ-বন্দীরা মুক্তিলাভ করতে পারে (সূরা মুহাম্মদ : ৫)। যুদ্ধবন্দী দাসগণ নির্ধারিত শ্রমের বিনিময়ে তাদের মুক্তির অধিকার পাবে (সূরা নূর : ৩৪)

বদরের যুদ্ধের পর 'মুক্তিপণ' নিয়ে যুদ্ধ-বন্দীদের অনেককেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং যারা 'মুক্তিপণ' দিতে পারে নাই, তারা মুসলমানদের লেখাপড়া শেখানোর বিনিময়েও মুক্তি পেয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে উচ্চ-মর্যাদা এবং পদের অধিকারী হয়েছে এবং বিয়ে-শাদী ইত্যাদি সামাজিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করেছে।

৪। গৃহের নিরাপত্তা ও নারী জাতির মৌলিক অধিকার :

গৃহের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ : অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করা যাবে না, নির্ধারিত গণ্ডীর বাইরে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা ব্যতীত নারীগণ বাইরে যাবে না (সূরা নূর ২৮-৩২)।

নারী জাতির মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামী-শিক্ষার বৈশিষ্ট হলো এই যে, সার্বিকভাবে মর্যাদার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান (সূরা আলে ইমরান : ১৯৬, নিসা : ১২৫, নাহল : ৯৮)। সেই সংগে সন্তান-প্রতিপালন এবং আনুসঙ্গিক কারণে নারীকে পুরুষের অভিভাবকত্বে রাখা হয়েছে এবং রুজী-রোজগারের সংস্থানের দায়িত্ব মূলত: পুরুষের উপরে বর্তানো হয়েছে (সূরা নিসা : ৩৫)।

পবিত্র কুরআনে স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য, সম্পত্তির অধিকার, মোহরানা, ভরণ-পোষণ, ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে (সূরা নিসা, বাকারাঃ ২২৯)

প্রাচীনকালের প্রচলিত নিয়ন্ত্রণহীন বহু-বিবাহের পরিবর্তে ইসলাম কতগুলো শর্তসাপেক্ষে এবং প্রয়োজনবোধে সর্বাধিক চারটি পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছে এবং প্রাসঙ্গিক শর্তাবলীর মধ্যে বিধবা ও এতীমদের প্রতিপালনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই আদেশ দেওয়া হয়েছে, অন্যথায় একজন স্ত্রীই যথেষ্ট বলে শিক্ষা দিয়েছে (সূরা নিসা : ৪)। স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই 'ত্বালাক' বা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং তৎসংগে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ও নিয়ম-কানুন আরোপ করা হয়েছে (সূরা বাকারা : ২২৮-২৪২)। বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বিবাহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (সূরা বাকারা : ২৩৫-

২৪১)। বৈবাহিক-সম্পর্কের বহির্ভূত যৌন সম্পর্ককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা হতে বাঁচার জন্য সতর্কতামূলক উপায় অবলম্বনের নির্দেশ দান করা হয়েছে (সূরা নিসা : ২৪-২৬, বনী ইসরাঈল : ৩৩, নূর : ২৮-৩৪)।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন : "হে আল্লাহ্‌, আমি দু'ধরনের দুর্বল লোকের অধিকারকে পবিত্র বলে ঘোষণা করছি–তাদের একজন এতীম এবং অপরজন নারী" (নিসাই)। বিদায় হজ্জের বাণীতেও এতীম, ক্রীতদাস এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা প্রদান করেছেন।

৫। পিতা-মাতা ও সন্তানের মৌলিক অধিকার :

পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার প্রতি 'ইহ্‌সান' (মঙ্গল) করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং 'শির্‌ক' ব্যতীত সকল ব্যাপারে পিতা-মাতাকে মান্য করতে হবে বলা হয়েছে। (সূরা লুকমান : ১৫-১৬, বনী ইসরাঈল : ২৪-২৫, আনকাবুত : ৯)। পক্ষান্তরে সন্তানের প্রতি সদ্ব্যবহার, যথার্থভাবে লালন-পালন এবং সুশিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদানের নির্দেশ রয়েছে (সূরা আহ্‌কাফ : ১৬-১৮, তাহ্‌রীম : ৭, মু'মিন:৫৯, শু'আরা : ৮৪, ত্বাহা : ১১৫)।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না এবং বড়দের অধিকার আদায় করে না, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।" (আবুদাউদ)।

৬। আইনের দৃষ্টিতে সম-অধিকার এবং ন্যায়-বিচারের নিশ্চয়তা :

মানুষ মূলত: একই জাতি হতে উৎসারিত এবং কালক্রমে নানা গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত হওয়ার কারণে তাদের মর্যাদার মাপকাঠি বংশ-পরিচয়, বাহ্যিক রূপ বা ধন-সম্পদ দ্বারা নিরূপিত হতে পারে না–বরং প্রকৃত মর্যাদা তাঁর সৎকর্ম, তার 'তাক্‌ওয়া' ও খোদাপ্রেমের দ্বারাই নির্ণীত হবে (সূরা বাকারা : ২১৪, হুজরাত :১৪)। তাই শাসন ও বিচার কার্যে নিয়োজিত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সর্বাবস্থায় 'আদল' বা ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করতে এবং প্রত্যেককে পক্ষপাতিত্ব পরিহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (সূরা নিসা : ৪৯, মায়েদাহ্‌ : ৯)। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ "হে বিশ্বাসীগণ, ন্যায় বিচার পালনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যাও।" (সূরা নিসা : ১৩৬)।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন : "হে আলী, যখন দু'জন লোক বিচারের জন্য তোমার কাছে আগমন করে, তখন উভয় ব্যক্তির জবানবন্দী না শুনা পর্যন্ত একজনকে রায় দিও না। কারণ বিচার্য বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক।" (তিরমিযী)। বিদায় হজ্জের পবিত্র সমাগমে তিনি মৌলিক মানবিক অধিকারের যে অমৃতবাণী ঘোষণা করেছিলেন, তাতে মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব এবং ন্যায়-বিচারের সত্যিকার মহাসনদ রচিত হয়েছে।

৭। সম্পদের মালিকানা এবং চুক্তি-সম্পাদনের অধিকার :

সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার প্রথম কথা হলো এই যে, সম্পদের প্রকৃত মালিকানা এবং কর্তৃত্ব খোদা তাআলার অধিকারভুক্ত এবং মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃজিত। এই বিশ্ব-চরাচরে মানুষ শুধুমাত্র 'আমানতদার' (Trustee) হিসেবে নির্ধারিত নিয়ম-কানুন প্রতিপালন সাপেক্ষে সেগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারে (সূরা বাকারা : ৪০, যুমার : ৬০-৬৪, মা'রিজ : ৩৩ যুখরুফ : ৮৬, নিসা : ৬, ৫৯, আনফাল : ২৮, বাকারা : ২৭৬)। সেই সংগে স্পষ্টত: ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই অবৈধ- উপায়ে সম্পত্তি আহরণ করা নিষিদ্ধ (সূরা বাকারা : ১৮২-১৮৩ নিসা : ১১, ৩০, মায়েদাহ্‌ : ৯১)। সম্পদ আদান-প্রদান, ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথাযথভাবে চুক্তি সম্পাদনের এবং উপযুক্ত সাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (সূরা বাকারা : ২৮৩)।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "সাবধান! তোমরা কারো উপর অত্যাচার করো না। কারো সম্পদ জবর দখল করে নেওয়া বৈধ নয়। কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় তার সম্পদ অন্যকে দিয়ে দেয়, সেটা ভিন্ন কথা।" (বায়হাকী)।

৮। সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মৌলিক অধিকার :

সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মৌলিক চাহিদা সমূহের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য ইসলাম একদিকে অন্যায় ও অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জনকে নিষিদ্ধ করেছে, অন্যদিকে পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থোপার্জনকে উৎসাহিত করেছে (সূরা হিজর : ৮৯, বাকারা : ২০২, সাফ : ১২)। দ্বিতীয়ত: দরিদ্র, অনাথ, অসহায় এবং অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রীয়-পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং ন্যূনতম মৌলিক-চাহিদা, বিশেষত: খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়-স্বাস্থ্যের জন্য এবং শিক্ষার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (সূরা ত্বাহা : ১১৯-১২০, নহল : মু'মিন ৫৯, জুমার : ১১ এর আলোকে)। মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীব্যাপী যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ এবং খাদ্য সরবরাহ প্রসারিত রয়েছে (সূরা হামীম সাজদা : ১১)।

ধনীদের সম্পদের মধ্যে দরিদ্র শ্রেণীর অধিকার রয়েছে এবং তা যাকাতের মাধ্যমে বন্টনের সুব্যবস্থা করতে হবে এবং অন্যান্য দান-খয়রাত ও সাদাকাতের নির্দেশ রয়েছে (সূরা বাকারা : ৪, ১১১, ২৬২-২৮২)। স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রদত্ত সম্পদের দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ খিলাফতের পরিচালনাধীন বায়তুল মাল কর্তৃক সংগৃহীত করে তদ্দ্বারা মানুষের সার্বিক-কল্যাণের জন্য অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে (সূরা বাকারা : ১৯৬, ২৭৪, হজ্জ : ৭৯ তাওবা : ৬০ এর আলোকে)।

বর্তমান যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) যাকাত ও অন্যান্য দান-খয়রাত ছাড়াও নিয়মিত হারে চাঁদা এবং ওসীয়্যত পদ্ধতি অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এই ওসীয়্যত-পদ্ধতির দ্বারা একদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-জনিত কঠোরতা এবং অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহের আত্মঘাতী অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কবল হতে মানব জাতিকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

৯। চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা :

আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন উৎকৃষ্ট উপাদানে এবং সে নীচতা দেখিয়ে নীচেও যেতে পারে, আবার বিশ্বাস ও সৎকর্ম দ্বারা মহা উন্নতিও লাভ করতে সক্ষম (সূরা ত্বীন)। ইসলাম সর্বতোভাবে ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়ে

ঘোষনা করেছে : “ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নাই, নিশ্চয়ই সত্যপথ এবং মিথ্যার মধ্যস্থিত ব্যবধান দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত” (সূরা বাকারা ২ : ২৫৭)। অনুরূপভাবে, সত্যের আহ্বানের প্রতি সাড়া দেওয়া বা না দেওয়ার জন্য মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। (সূরা কাহফ : ৩০)। আল্লাহ্ তাআলার পথে জ্ঞান ও উত্তম-যুক্তির মাধ্যমে আহ্বান জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (সূরা নাহল : ১২৬)।

আক্রান্ত এবং অত্যাচারিত অবস্থা ব্যতীত ইসলাম যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে সকল যুদ্ধ করেছেন, সেগুলো আত্মরক্ষামূলক এবং শত্রু-পক্ষের সন্ধি-শর্তাবলী লংঘনের কারণে সংঘটিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন : “যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে শুধু তাদের জন্য, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং যাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে–আল্লাহ্ তাআলা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম (সূরা হজ্জ : ৪০)। যুদ্ধ চলাকালে আক্রমণকারীকে দৃঢ়তার সংগে প্রতিহত করতে হবে, কিন্তু সর্বাবস্থায় সীমালজ্ঘন করা নিষিদ্ধ–নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা সীমালজ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না (সূরা বাকারা : ১৯১-১৯৭)। সন্ধির প্রস্তাব করা হলে তা গ্রহণ করার জন্য ইসলামে নির্দেশ রয়েছে (সূরা আনফাল : ৬২) এবং পারস্পরিক সম্পাদিত-চুক্তির শর্তাবলীর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে (সূরা তাওবা : ৬-১৪)।

ইসলামের ইতিহাস একথায় এ জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে যে, নবুওয়াতের দাবী হতে শুরু করে হিজরত পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৩ বছর ছিল হযরত রসূল করীম (সা.) এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য চরম অত্যাচার এবং কষ্টভোগের সময় দ্বিতীয়ত: হিজরতের পর হতে হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত সময়ও ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যাচার ভোগের সময় কারণ, সংখ্যা ও যুদ্ধ-উপকরণ, উভয় দিক দিয়েই তাঁরা নগণ্য ছিলেন এবং এতদসত্বেও তাদেরকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তৃতীয়ত:, হুদায়বিয়ার সন্ধি হতে মক্কা বিজয় পর্যন্ত বিস্তৃত সময় ছিল শান্তি ও সন্ধির কাল। এই সময় ইহুদী ও অন্যান্য গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আত্মরক্ষামূলক সামরিক-তৎপরতায় বাধ্য হয়ে মুসলমানদেরকে নামতে হয়েছিল। ইতিহাস একথারও সাক্ষ্য বহন করছে যে, এই সকল পর্যায়ে একজন আরববাসীকেও তরবারীর দ্বারা মুসলমান করা হয় নি। ইসলামের নামে অথবা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারিত শক্তি-প্রয়োগের অপবাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্ম দায়ী নয়, বরং সেই অপপ্রচারকারীগণের অজ্ঞতা এবং বিদ্বেষপরায়ণতাই দায়ী। ইসলামে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ এবং গুপ্ত-হত্যার কোন স্থান নাই। ধর্মের নামে রক্তপাতের জন্য ধর্ম দায়ী নয়, দায়ী রক্তপাতকারীরাই।

১০। জাতীয় অধিকার : নির্বাচন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা –

ইসলাম পার্থিব-ব্যাপারে শাসক ও শাসিতের অধিকার সম্পর্কে যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করেছে। শাসনকার্য পরিচালনায় উপযুক্ত লোককে নির্বাচন করার অধিকার দিয়েছে (সূরা নিসা ; ৫৯)। বংশগত রাজতন্ত্র এবং স্বৈরাচারী শাসন ইসলাম-সমর্থিত নয়। শাসকের প্রতি নির্দেশ হলো, তারা ‘আদল’ বা ন্যায়-বিচারের আদর্শকে সর্বাবস্থায় মেনে চলবে (সূরা নিসা : ৫৯, আনফাল : ২৮)। শাসিতদের জন্য নির্দেশ হলো, তারা শাসকের আদেশ মেনে চলবে (সূরা নিসা : ৬০)। প্রত্যেককেই আমানত এবং অঙ্গীকারসমূহ মেনে চলতে হবে (মুমেনুন : ৯, মা'রিজ : ৩৩)। সার্বিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শাসন কার্যের বৃহত্তর কল্যাণের নিমিত্তে জনসাধারণ অথবা প্রতিনিধিদের সংগে পরামর্শ করা আবশ্যক। (সূরা শূরা : ৩৯, আলে ইমরান : ১৬০)।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী হযরত রসূল করীম (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। বুদ্ধি, বিবেচনা এবং চেতনাবোধ অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের মত-প্রকাশের অধিকার রয়েছে (সূরা রা'দ : ১৬ সূরা কাহাফ : ৩০)।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন : “তোমরা প্রত্যেকেই নিজ ক্ষেত্রে এক একজন শাসক এবং প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।” (বুখারী, মুসলিম)

১১। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার :

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম সর্বপ্রথম সহনশীলতার শিক্ষা প্রদান করেছে, পারস্পরিক সমঝোতা এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করতে বলেছে। আলোচনা ব্যর্থ হলে সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধের মাধ্যমে বিবাদ ও মত-বিরোধের মীমাংসা এবং ন্যায় বিচার করার জন্য সুষ্ঠু-পদ্ধতির উল্লেখ করেছে। (সূরা হুজুরাত : ১০)। মুসলিম সমাজের ঐক্য এবং সংহতির লক্ষ্যে পবিত্রকরণ ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সকল কার্য সমাধা করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং খিলাফত ভিত্তিক সংগঠনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে (সূরা নিসা : ৩০, আলে ইমরান : ১০৪-১০৬, নূর : ৭ম রুকু)। আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন : “তোমরা আল্লাহ্‌র খাতিরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হও এবং সেক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ‘আদল’ ও ‘ইনসাফ’ বিসর্জনে প্ররোচিত করতে না পারে।” (সূরা মায়েদা : ৯)। বাস্তবক্ষেত্রে নমুনা হিসাবে মদীনার বিভিন্ন গোত্রের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য রচিত মদীনা চুক্তি, মক্কাবাসীদের সঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধি, নাজরানের খৃষ্টানদের প্রতি এবং পার্শী ধর্মাবলম্বীদের প্রতি প্রদত্ত নিরাপত্তা সনদের শর্তাবলী প্রণিধানযোগ্য।

প্রসঙ্গত : জাতি সমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়-ভিত্তিক সুসম্পর্কই বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ– এই বিষয়ে সম্প্রতি ওয়াশিংটন ডিসি-এর ‘ক্যাপিটাল হিল’-এর কংগ্রেস ভবনে প্রদত্ত নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর ভাষণের অংশ বিশেষ প্রণিধান যোগ্য :

“স্মরণ রাখবেন, অন্যায় ও অবিচার বিরাজমান থাকলে কখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। অতএব, কোন দেশ যদি সকল ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করে এবং অন্য আরেক দেশকে আক্রমণ করে ও অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ করায়ত্ত করতে চায়, তাহলে এই নিষ্ঠুরতা দমানোর জন্য অন্য দেশগুলোর অবশ্যই পদক্ষেপ নেয়া উচিত। কিন্তু একাজে তাদেরকে সর্বদা ন্যায়-নীতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামী শিক্ষানুসারে যেসব পরিস্থিতিতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, তা সবিস্তারে কুরআনের ৪৯ নম্বর সূরার ১০ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত আছে। পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয় যে, যখন দু'টি জাতি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়, আর বিবাদ যুদ্ধে পর্যবসিত হয়– তখন অন্যান্য সরকারের উচিত, তাদেরকে সংলাপ এবং দ্বি-

পাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আলোচনার প্রতি জোরালোভাবে আহ্বান জানানো, যেন তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিষ্পত্তি করে একটি সন্ধি বা মীমাংসায় উপনীত হতে পারে। তবে যদি কোন এক পক্ষ চুক্তির শর্ত মেনে না নেয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ করে, তাহলে আগ্রাসীকে থামানোর জন্য অন্য দেশগুলোর সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করা উচিত। আগ্রাসী যখন পরাজিত হয়ে যায় এবং পারস্পরিক আলোচনায় বসতে সম্মত হয়– তখন সকল পক্ষের এমন একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য কাজ করা উচিত, যা দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ও মীমাংসার পথ সুগম করবে। কোন জাতিকে শেকলাবদ্ধ করার জন্য তার বিরুদ্ধে কঠোর ও অন্যায় কোন শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। কেননা, এর দীর্ঘ-মেয়াদী ফলাফল হলো অস্থিরতা, যা আরো বিভৎস রূপ ধারণ করবে এবং বিস্তৃত হবে। পরিণামে ছড়িয়ে পড়বে আরো নৈরাজ্য। আমরা যদি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থকে ত্যাগ করতে হবে এবং এর পরিবর্তে বিশুদ্ধ ন্যায়-পরায়ণতার উপর পারস্পরিক-সম্পর্কের মজবুত ভিত গড়তে হবে।" (ভাষণের তারিখ ২৭/০৬/২০১২)

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত নীতি-নির্ধারণী বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা-ব্যবস্থা পরিচালিত হলে সহজেই যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের অবসান হতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে।

১২। উদাত্ত আহ্বান :

উপসংহারে উল্লেখ করতে চাই যে, ইসলাম ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও আন্তর্জাতিক-জীবনের সকল বিষয়ের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা এবং নির্দেশাবলী প্রদান করেছে। একথা অনস্বীকার্য যে, এই সকল শিক্ষা এবং হযরত খাতামান্নাবীঈন (সা.) এর আদর্শের বিশ্বব্যাপী পুন:প্রতিষ্ঠার মধ্যেই মৌলিক মানবাধিকার জনিত সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান নিহিত। বর্তমানে ইসলাম-নির্দেশিত খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সকল শিক্ষা, নীতিমালা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে (সূরা নূর ; ৭ম রুকু দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে ইসলামী-খেলাফত ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সংগঠন, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র অথবা জাতিসংঘের ঘোষণা দ্বারা কার্যকরভাবে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমে সত্যিকার ইসলামী নীতি ও মহানবী (সা.) এর আদর্শের পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য এবং 'হুকুকুল্লাহ্'ও 'হুকুকুল ইবাদ' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বর্তমানে পৃথিবীতে ২০০টিরও অধিক দেশে ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার সুসংগঠিত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে চলেছে এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী শান্তির-ধর্ম ইসলাম এবং বিশ্বের কল্যাণ মহানবী (সা.) সম্পর্কে যে সকল ভ্রান্ত-ধারণা, অপ-প্রচার এবং ব্যাঙ্গাত্মক চিত্র-কলা, কার্টুন, ইত্যাদি সাম্প্রতিক কালে অধিক মাত্রায় প্রকাশ করা হচ্ছে, সেগুলোর যথোপযুক্ত এবং অকাট্য সদুত্তর প্রদানের জন্য বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা অক্লান্তভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছেন। তেমনিভাবে পৃথিবীর সামরিক-শক্তিধর রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে বিশেষভাবে-লিখিত সতর্কীকরণমূলক পত্রাদির মাধ্যমে যোগযোগ করা হচ্ছে। ফলত: ইসলাম ও মহানবী (সা.) এর মানবতাবাদী প্রকৃত-শিক্ষা এবং আদর্শ সম্পর্কে বিশ্ববাসী সম্যকভাবে জানতে পারছে। খেলাফত ব্যবস্থা থাকার কারণে এই মহান কার্যক্রম সুসমন্বিত এবং সু-পরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্যতীত বর্তমানে পৃথিবীতে আর কোথাও খেলাফত ব্যবস্থা নাই এবং মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য পৃথিবীব্যাপী ঐশী-নির্দেশিত এবং ঐশী-প্রতিশ্রুতি ব্যতিত আর কোন বিকল্প-পথ ও পন্থা নাই। তাই বিষয়টি গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য বিশ্ববাসীকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানানো খুবই প্রয়োজন। ***'ইনসানিয়াত' – যিন্দাবাদ!!***

বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্র-প্রধানদের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর লিখিত পত্রাদির মধ্য থেকে অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

বর্তমানে ভয়াবহ উত্তেজনা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। কতিপয় এলাকায় ক্ষুদ্রাকারের যুদ্ধ দেখা দিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বৃহৎ-শক্তিগুলো তাদের প্রচেষ্টা দ্বারা এসব যুদ্ধাক্রান্ত এলাকায় শান্তি স্থাপনে সুফল লাভ করেনি। বৈশ্বিকভাবে আমরা লক্ষ্য করি, প্রায় প্রত্যেক দেশই এমন কার্যকলাপে লিপ্ত, যা এসব যুদ্ধকে হয় সমর্থন, নয়তোবা অন্যান্য দেশের বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে। যাহোক, ন্যায়-বিচারের প্রয়োজনীয়তাটি পূর্ণ হচ্ছে না। এটা দুঃখের বিষয়, আমরা যদি এখন বিশ্বের বর্তমান অবস্থাটি অনুধাবন করি, তবে দেখতে পাই যে, আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতোমধ্যেই স্থাপন করা হয়ে গেছে। যেহেতু ছোট ও বড়, উভয় প্রকারের অনেক দেশই আণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়েছে, তাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ দিন-দিন বেড়েই চলেছে। এ ধরনের সঙ্কটময় অবস্থায় আমাদের সামনে প্রায় আকস্মিকভাবেই তৃতীয়-বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সম্ভবনা বিরাজ করছে। এমন একটি যুদ্ধ অবশ্যই পারমাণবিক-যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সে-কারণে আমরা বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে ভয়াবহ ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি নিরপেক্ষতা ও ন্যায় বিচারের পথকে অনুসরণ করা হতো, তবে বিশ্বের বর্তমান অবস্থাটি আমাদের দেখতে হত না, যা দ্বারা বিশ্বকে আরেকবার যুদ্ধের জ্বলন্ত শিখার মধ্যে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হতে হচ্ছে।

যেহেতু আমরা সবাই এটা জানি, যেসব কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেটা ছিল *'লীগ অব ন্যাশনস'*-এর ব্যর্থতা এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট, যা ১৯৩২ সনে শুরু হয়েছিল। আজ প্রধান-প্রধান অর্থনীতিবিদগণ বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং ১৯৩২ সনের অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে অনেকগুলো সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। আমরা এটা লক্ষ্য করছি, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো আরেকবার ছোট-ছোট জাতিগুলোকে যুদ্ধের দিকে চালিত করছে এবং অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও অসন্তোষ এসব দেশের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান। পরিণামে এটা কতিপয় শক্তিকে সরকারের হাল ধরতে এগিয়ে আনবে, যারা আমাদেরকে বিশ্বযুদ্ধের দিকে চালিত করবে। ছোট দেশগুলোর মধ্যকার সংঘাত যদি রাজনীতি অথবা কূটনীতির মাধ্যমে নিরসন করা না যায়, তবে তাতে বিশ্বে নতুন নতুন গোষ্ঠি ও দলের উদ্ভব হবে। এটা হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আকস্মিক প্রকাশের এক পূর্বাভাস। অতএব, আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বে এখন উন্নয়নের বিষয়কে ফোকাস করার পরিবর্তে ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্যে জরুরী ভিত্তিতে আমাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা উচিত। মানবজাতির জন্য তাদের একক খোদা, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তাকে চেনা আবশ্যক। আর এটাই হচ্ছে মানবতার টিকে থাকার একমাত্র রক্ষাকবচ। এর অন্যথা হলে বিশ্ব দ্রুতলয়ে আত্মবিনাশের দিকে ধাবিত হবে।"

(সূত্র : **Review of Religions April, 2012**)

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

হযরত মহানবী (সা.) সমগ্র বিশ্বের জন্য কেবল রহমতই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন দয়ার এক মহা সাগর। তিনি (সা.) মহান আল্লাহ্ তাআলার রঙে এমনভাবে রঙীন হয়েছিলেন, যার তুলনা করা যায় না। মহানবী (সা.) সমগ্র বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্র রঙ ধারণ করার পদ্ধতি এবং কৌশল শিখিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন, মানুষ যেন খোদা তাআলাকে লাভ করতে পারে। যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'সিবগাতাল্লাহ্'-অর্থাৎ হে মানবমন্ডলী! তোমরা আল্লাহ্ তাআলার রঙে রঙীন হও। মহান খোদার এই আদেশের বাস্তবায়ন করার জন্যই মহানবী (সা.)-এর আগমন।

এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি যতখানি আল্লাহ্ তাআলার রঙে রঙীন হয়েছেন, তিনি ততখানি আল্লাহ্ওয়ালা মানুষের পরিণত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু বলেছেন তাঁর রঙে রঙীন হওয়ার জন্য, তাই আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে, আল্লাহ্ তাআলার রঙ কি? বা তাঁর মধ্যে কি কি গুণাবলী রয়েছে। যদিও মহান খোদা তাআলার গুণাবলী অসীম ও অনন্ত। তথাপি তাঁর অসীম ও অনন্ত গুণকে সূরা ফাতেহায় চারটি মৌলিক গুণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এ চারটি মৌলিক গুণের নাম রবুবিয়াত, রহমানিয়াত, রহিমিয়াত ও মালিকিয়াত।

আমরা যদি মহান খোদা তাআলার এই চারটি মৌলিক গুণের বিশ্লেষণ করি, তাহলে যে-বিষয়টি স্পষ্টভাবে সামনে আসে, তা হলো-আল্লাহ্ তাআলা হচ্ছেন সর্বাধিক মানব-প্রেমিক ও মানব দরদী। কেননা, তিনিই আমাদের রব্ব। যেমনভাবে তিনি রহমান, তেমনি তিনি রহিম আবার তিনি মালিকও। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে এত ভালবাসেন যে, কোন মায়ের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তাআলার উল্লেখিত চারটি মৌলিক গুণের বিশেষ-অধিকারী হলেন তাঁর নবী রসূলগণ। নবী রসূলগণের মধ্যে আবার এই মৌলিকগুণের সর্বাপেক্ষা বেশী অধিকারী ছিলেন বিশ্বনবী ও শ্রেষ্ঠ-নবী খাতামান নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তিনি হলেন রহমতুল্লিল আলামীন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন মানবজাতির প্রতি অসীম রহমতরূপে।

আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর বিনয়, নম্রতা ও দয়াসুলভ আচরণের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই, তিনি (সা.) এ সবগুলো গুণেই সমৃদ্ধ ছিলেন। কোন ধরণের গুণ অবশিষ্ট নেই, যা তাঁর মধ্যে ছিল না। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ***'লাও আনজালনা হাজাল কুরআন আলা জাবালিলারাইতাহু খাশিআম মুতাছাদ্দেআম মিন খাসিয়াতিল্লাহ্ ওয়া তিলকাল আমাছালু নাদ্‌রিবুহা লিন্নাসে লাআল্লাহুম ইয়াতাফাক্কারুন'*** (সূরা আল হাশর : ২২) ▯

অর্থাৎ 'অতএব এই কুরআন, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা যদি কোন পাহাড়ের প্রতি অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি অবশ্যই একে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখতে। আর এসব দৃষ্টান্ত আমরা এজন্য বর্ণনা করছি যেন মানুষ ঐশী বাণীর মাহাত্ম্য বুঝার জন্য চিন্তাভাবনা করে'।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সৈয়দনা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন: ***'কোন ব্যক্তি ঐশী ভালোবাসা ও খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দু'টি বৈশিষ্ট্য বা গুণ তার মাঝে জন্ম না নেয়। প্রথমতঃ অহংকার পরিহার করা, যেভাবে সুদৃঢ় পাহাড় যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, তা ধ্বসে মাটিতে মিশে যায়। অনুরূপভাবে মানুষের উচিত, সকল প্রকার গর্ব ও অহংকার পরিহার করা, আর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা।'***

এই আয়াতে এই গুঢ়-তত্বই বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা-ই সেই সত্তা ছিল, যিনি বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সকল মানবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিলেন, একারণেই পবিত্র কুরআনের মত মহা মর্যাদাপূর্ণ বাণী তাঁর পবিত্র-হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর বিনয়, নম্রতা ও কোমলতায় উন্নতি করে তিনি আপন সত্তাকে এত বেশি বিলীন করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তাআলার সত্তায় এমনভাবে বিলীন হয়ে বা মিশে গেছেন যে, খোদার নৈকট্যের ক্ষেত্রে তিনি সেই মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন যে পর্যন্ত ফিরিশ্‌তারাও পৌঁছতে পারে নি। যেভাবে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন: ***'সেই সর্বোচ্চ মানের জ্যোতি:, যা মানবকে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ-উৎকর্ষ-মানবকে, যা ফিরিশ্‌তাদের মাঝে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না***

আর সূর্যেও ছিল না। যা পৃথিবীর সমুদ্র এবং নদীগুলোতেও ছিল না, ছিল না মণি-মানিক্যে, পদ্মরাগ মণিতে, চুনিপান্না এবং হীরা জহরতে। মোটকথা, তা আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষের মধ্যেই ছিল না। ছিল কেবল মানবের মাঝে, অর্থাৎ-পূর্ণ-মানবের মাঝে; যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ, সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব হলেন আমাদের নেতা ও মনিব, নবীকূল শিরোমনি, জীবন-প্রাপ্তদের সর্দার, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম- পৃষ্ঠা: ১৬০-১৬১)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন নবীর জীবনিতিহাস পাঠ করে কি জানা যায়, কিরূপ ভালোবাসা তিনি (সা.) সৃষ্টির প্রতি রাখতেন? মানুষের জন্য এত দরদ, এত প্রেম আর এমন অসাধারণ ভালোবাসা অন্য কোন রসূলের মধ্যে ছিল না, আর থাকতেও পারে না। কারণ, তিনি (সা.) হলেন সমগ্র বিশ্বের এবং সমগ্র জাতির হেদায়াতদাতা।

পবিত্র কুরআনে মহান খোদা তাআলা বলেন, ***'লাকাদ যা আকুম রাসূলু মিন আনফুসিকুম আজিজুন আলাইহি মা আনিতুম হারিছুন আলাইকুম বিল মু'মিনিনা রাউফুর রাহীম'*** (সূরা আত্ তাওবা:১২৮)। অর্থাৎ 'নিশ্চয় তোমাদেরই মাঝ থেকে এক রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে। তোমাদের কষ্ট ভোগ করা তাঁর কাছে অসহনীয় এবং সে তোমাদের কল্যাণের পরম আকাঙ্ক্ষী। সে মু'মিনদের প্রতি অতি মমতাশীল ও বার বার কৃপাকারী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই আয়াতের তফসীরে বলেন: 'আকর্ষণ ক্ষমতা এবং দৃঢ়চিত্ততা একজন মানুষকে তখনই দেয়া হয়, যখন সে ঐশী-নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে, আর খোদার প্রতিচ্ছায়া হয়, আর সে সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও তাদের কল্যাণের জন্য নিজের মাঝে ব্যাকুলতা অনুভব করে। আমাদের নবী (সা.) এই গুণের ক্ষেত্রে সকল নবী আলাইহিমুস সালাম এর চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। একারণে তিনি সৃষ্টির দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আজিজুন আলাইহি মা আনিতুম অর্থাৎ -তোমাদের কষ্টে নিপতিত হওয়া এই রসূলের জন্য অসহনীয়, এতে তিনি চরম ব্যথিত এবং সবসময় তিনি অত্যন্ত আগ্রহভরে তোমাদের অশেষ-কল্যাণ প্রত্যাশা করেন'।

মানবের প্রতি মহানবী (সা.)-এর যে ভালোবাসা ছিল, তা তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর তায়েফ গমনের ঘটনা সর্বজন বিদিত। মক্কায় আল্লাহ্ তাআলার তৌহিদ প্রচার করার ব্যাপারে কিছুটা ব্যর্থ হয়ে তিনি তায়েফ নগরীতে গমন করেন। মহানবী (সা.) ভাবলেন, তায়েফবাসী হয়তো বা তার কথায় কান দিবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার তৌহিদের বাণী তায়েববাসীরা শোনাতো দূরের কথা, বরং তাঁর (সা.) উপর অমানবিক যুলুম অত্যাচার করল। তায়েববাসীরা বখাটেদেরকে তাঁর (সা.) পিছনে লাগিয়ে দেয় এবং তারা পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর জ্যোতির্ময় পবিত্র দেহকে রক্তাক্ত করে দেয়। আত্মরক্ষার্থে মানব দরদী রসূল (সা.) দ্রুতপদে তায়েফ ত্যাগ করেন। তিনি যখন তায়েফের উপকণ্ঠে পৌঁছেন তখন আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে ফিরিশ্‌তা এসে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি যদি চান, তাহলে এই যালিম শহরবাসীদেরকে আল্লাহ্ তাদের পাপের দরুন ধ্বংস করে দিবেন।' ফিরিশতার কথার জবাবে মানব-প্রেমী রসূল (সা.) আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দু'হাত তুলে এই দোয়াই করলেন, 'হে খোদা! তারা অজ্ঞ, তাই আমার উপর যুলুম করেছে। তুমি এদেরকে ক্ষমা কর এবং হেদায়াত দাও।'

নবুওয়াত লাভের পর মক্কী-জীবনে তিনি (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ (রা.) যে পৈশাচিক যুলুম-নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন, তার ইতিহাস আমরা সবাই জানি,আবুজাহল ও আবুলাহাবের দল তাঁর উপর জঘন্য শারিরীক নির্যাতন চালিয়েছিল। প্রায় তিন বছর তাঁকে ও সাহাবীগণকে নির্বাসিত-জীবন যাপন করতে হয়েছিল। বহু নিরাপরাধ মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। অবশেষে যালিমদের যুলুম-নির্যাতনে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেলেন। যেদিন তিনি মহাবিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন, সেদিন মক্কাবাসীরা ভেবে ছিল, আজ নিশ্চয়ই তাদের নিস্তার নেই। তারা ভয়ানক শাস্তির প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু রহমতুল্লিল আলামিন, মানব দরদী রসূল সবাইকে অবাক করে দিয়ে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করলেন। তিনি বললেন, আজ যারা বিলালের পতাকার নীচে এসে দাঁড়াবে, তাদের সকলকে ক্ষমা করা হবে। মহান আল্লাহ্ তাআলার রহিমিয়াত ও রহমানিয়াতের গুণে পরিপূর্ণরূপে গুণান্বিত না হলে এমন সাধারণ-ক্ষমা করা কি সম্ভব?

তিনি (সা.) সেই মানব-দরদী রসূল, যিনি বিচলিত চিত্তে এক ইহুদী শিশুকে তার মৃত্যুশয্যায় দেখতে যান এবং দরদ ভরা হৃদয়ে তাকে তৌহিদের বাণী শুনান এবং তিনি সেই মানব প্রেমিক রসূল যিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে ঐ বৃদ্ধাকে দেখতে যান, যে তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। এইতো সেই রহমতুল্লিল আলামীন, যিনি মানবতার সম্মানে ইহুদীর লাশ দেখে দাঁড়িয়ে যান। তিনিই সেই ক্ষমাশীল রসূল, যার মহান ক্ষমায় তাঁরই সামনে নিবেদিত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় হাজার হাজার বিধর্মীরা আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি সেই পরম স্নেহময় রসূল, যার অকৃত্রিম স্নেহের স্পর্শে পালিত-পুত্র যায়েদ (রা.) স্বীয় পিতামাতার নিকট ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানায় এবং স্নেহময় রসূলের নিকট সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। তিনি সেই বাদশাহ্ রসূল, যিনি তাঁর সবকিছু দুহাতে বিলিয়ে দিয়ে নি:স্ব অবস্থায় তাঁর পরম স্নেহময় প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিউ....। এমন মহান আদর্শ, দয়া, মহানুভবতার শিক্ষা কি আর কোন নবীর জীবনে লক্ষ্য করা যায়?

হযরত নবী করীম (সা.) প্রেম-ভালোবাসা, দয়া এবং তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাবে মানব হৃদয়কে জয় করেছিল। তিনি (সা.) সমগ্র বিশ্বে এক মহান-বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন। কিন্তু এটা কোন্ বিপ্লব ছিল? এই বিপ্লব সম্বন্ধে আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেন :–

"আরবের মরুভূমিতে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। লক্ষ লক্ষ মৃত-ব্যক্তি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জীবিত হয়ে গেল। অতীতের বিকৃত মানুষগুলো খোদার রঙে রঙীন হয়ে গেল। অন্ধরা চক্ষুষ্মান হলো। মুকদের কণ্ঠে খোদার তত্ত্বজ্ঞান জারী হলো। পৃথিবীতে একবারই এরূপ বিপ্লব ঘটলো। পূর্বে না কেউ তা দেখেছে, না কেউ তা শুনেছে। তোমরা কি জান, এই বিপ্লব কি ছিল? এটা একজন 'ফানা-ফিল্লাহ্'র অন্ধকার গভীর রাতের দো'য়াই তো ছিল। তিনি পৃথিবীতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এবং ঐ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়ে দেখালেন, যা এই নিরক্ষর, অসহায়-ব্যক্তির পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল।" (বারাকাতুত্ দো'আ)।

(চলবে)

masumon83@yahoo.com

ইসলামে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, অতিথি আপ্যায়ন ও আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য

মোহাম্মদ আবদুল জলিল

আহমদীয়া মুসলিম জামাতে বয়'আত গ্রহণের ১০টি (দশ) শর্ত রয়েছে। সাধারণ মুসলমানগণ ১০টি শর্তের ১ থেকে ৯নং শর্ত পুরোপুরি না মানলেও কিছু কিছু পালন করেন। কিন্তু বয়'আতের ১০নং শর্তটি একমাত্র আহমদী মুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর এ কারণেই আহমদী মুসলমানগণ হাদীস মোতাবেক ইসলামে ৭৩টি ফিরকার ৭২টি একদিকে আর আহমদী মুসলমানগণ একাই অপরদিকে। এ বিষয়টি ৭২ ফিরকার লোকেরাই লিখিতভাবে পাকিস্তানের পার্লামেন্ট এক বিশেষ অধিবেশনে বিশেষ আইন পাশ করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন।

এ বিষয়ে আলোচনায় না গিয়ে আমার লেখার বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে মূল বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেমন; দশ নাম্বার শর্তটি হলোঃ *"আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ আলাইহেস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতবেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবকসুলভ অবস্থার মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না" (ইশতেহার তকমীলে তবলীগঃ ১২ জানুয়ারী, ১৮৮৯ খৃঃ)*

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৮৫ সালের প্রারম্ভে বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবর্গ এবং ইসলামের শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে নির্দশনসমূহ প্রত্যক্ষ করার আহবান জানান। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর দাবী-সম্বলিত একটি প্রচার পত্র ইংরেজী এবং উর্দূ উভয় ভাষাতেই বিশ হাজার সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এ প্রচারপত্র বিশ্বের সকল রাজা-বাদশাহ্, উজীর ও ধর্মীয় নেতাগণকে প্রেরণ করেন। তাঁদেরকে এই বলে আহবান করা হয় যে, যদি ইসলামের সত্যতা, কিম্বা মহানবী (সা.)-এর সত্যতায় তাদের কোন সন্দেহ থাকে, কিম্বা ইল্‌হাম অথবা স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন আপত্তি, কিম্বা পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে, তবে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বা পত্রালাপ দ্বারা সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন।

এর সঙ্গে 'আহবান ঘোষণা' নামক একটি পত্রও প্রকাশ করেন। এতে পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবর্গকে 'নিদর্শন দর্শনের' জন্য আমন্ত্রণ জানান। এতে লিখিত ছিল ***'যদি আপনি আসেন এবং এক বছর অবস্থান পূর্বক কোন স্বর্গীয় নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করেন, তবে মাসিক দু'শত টাকা হিসাবে আপনাকে ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা দিব।'*** *(তবলীগে-রেসালত, ১ম খন্ড, ১২ পৃঃ এবং হায়াতে আহমদ, ২য় খন্ড, তয় সংখ্যা, ১১৬ পৃঃ হায়াতে তাইয়েবা-১২০-১২১ পৃঃ)* । হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আহবানে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বা নেতারা কেউই কাদিয়ানে আসে নাই। তবে সাধারণ মুসলমান ও অন্যান্যরা সহস্র সহস্র সংখ্যায় এসেছেন ***'যদিও মাঝে মাঝে অতিথি সমাগম কিছু কম হয়, কিন্তু কখনো কখনো খুব ব্যাপকহারে তাদের আগমন শুরু হয়ে যায়। বস্তুত এ সাত বছরে ষাট হাজারেরও অধিক অতিথি এসে থাকবেন'*** । (ফতেহ ইসলাম পৃঃ-১৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর 'ফতেহ ইসলাম' পুস্তকে বলেন, ***'খোদা তা'লা এখন এই ইসলামকে সঞ্জীবিত করতে ইচ্ছা করেছেন। এই মহান জরুরী কার্য সাধনের জন্য সকল দিক দিয়া ফলপ্রদ একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান তাঁহার তরফ হইতে প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক ছিল। তাই সেই মহা-জ্ঞানী সর্ব শক্তিমান খোদা জগদ্বাসীর সংস্কারের জন্য এই অধমকে প্রেরণ করে তাই করেছেন এবং জগদ্বাসীকে সত্য ও সততার প্রতি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে সত্যের সাহচর্য ও ইসলাম প্রচার কার্যকে কতিপয় শাখায় বিভক্ত করেছেন'*** । তিনি যে পাঁচটি শাখার কথা উল্লেখ করেছেন, এর তৃতীয় শাখাটি হলো ***'অতিথি আপ্যায়ন'*** (ফতেহ্ ইসলাম, বাংলা অনুবাদ: ১৩-১৫ পৃঃ) প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন দেখে এবং গবেষণা করে অসংখ্য মানুষ আহমদীয়া মুসলিম জামাতে বয়'আত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কাদিয়ান আজও ইসলামের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য উন্মুক্ত। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পর একে একে বর্তমানে ৫ম খিলাফতের অধীনে বিশ্বব্যাপী ২০২টি দেশে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১২৩ বছর পর আজও কাদিয়ানে ইসলামের প্রকৃত রূপ বিরাজমান। শুধু কি কাদিয়ানে, না! পাকিস্তানের রাবওয়া এবং বর্তমানে খিলাফতের অস্থায়ী কেন্দ্রে লন্ডনেও ইসলামের সৌন্দর্য এখনো অম্লান। এর কারণ কি? কারণটি হচ্ছে–'খিলাফতের কল্যাণ' আর বয়'আতের দশম শর্ত !

আজকাল বিভিন্ন সমাজে আহমদীদের আলোচনায় জানা যায়, আগে আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় ও মজবুত ছিল; এখন মনে হয় যেন তা স্থিমিত হয়ে গেছে। এর কারণ কি? বিশ্লেষণ করলে সকলেই একমত হবেন, আর তা হলো, আগে সকল আহমদীদের বাসা-বাড়ী ছিল 'মিনি কাদিয়ান' অর্থাৎ, যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বয়'আতের দশম শর্তে উল্লেখ করেছেন, তা প্রত্যেক আহমদীর বাড়ীতে পরিদৃষ্ট হতো। কাদিয়ানের ছায়া ছিল সেসব বাসা-বাড়ীতে। এখন যদি আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন শিথীল হয়ে থাকে, তাহলে এর প্রধান কারণ হলো, আমরা আমাদের বাসস্থানকে 'মিনি কাদিয়ান' বানাতে পারি নি বা কাদিয়ানের ছায়া আমাদের বাসা-বাড়ীতে নেই। সমগ্র বিশ্বে লোকেরা আমাদেরকে ব্যঙ্গ করে হোক বা যেভাবেই 'কাদিয়ানী' বলে সম্বোধন করে। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে আমরা কি সত্যিকার 'কাদিয়ানী' হতে পারছি? এর জন্য কী আমরাই দায়ী নই?

মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, "আর তাঁরই (আল্লাহ্‌র) ভালবাসায় তারা অভাবী, এতীম এবং বন্দীদের খাওয়ায়"

(আর তারা বলে,) আমরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও চাই না....সুতরাং, আল্লাহ্ সে দিনের অকল্যাণ থেকে তাদের রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন" (সূরা আদ্ দাহর: ৯,১০ ও ১২)।

প্রত্যেক বছর লন্ডন জলসার আগে এবং পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ 'মেহমান নেওয়াযী' বা 'অতিথি আপ্যায়ন' ও 'অতিথিদের সাথে আন্তরিক ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার' বিষয়ে দীর্ঘ খুতবা দিয়ে থাকেন। অতি সম্প্রতি ৩১ আগস্ট, ২০১২ তারিখের খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ৭, ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে যুক্তরাজ্যের ৪৬তম জলসা উপলক্ষে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এবং তাঁর সাহাবী (রা.)-দের এবং এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অসাধারণ 'অতিথিসেবা ও 'ভালবাসার' অনুসরণযোগ্য ঘটনাবলী তুলে ধরেন। হুযূর (আই.) বলেন, 'মু'মিনদের জন্য নির্দেশ হচ্ছে, পুণ্য-কর্মে অগ্রগামী হও।

সাধারণ জাগতিক লোকেরাও আতিথিয়তা করে থাকে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী লোকেরাও এমন আতিথিয়তা করে থাকেন। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'আল্লাহ্‌র সৃষ্টি' মানুষের সেবার ফলে এমন লোক পুণ্যে হকদার হবে- একথা নিশ্চিত। কিন্তু, কোন কাজ যখন বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার জন্য করা হয়, অর্থাৎ যদি নিজস্ব অতিথি বা আত্মীয়-স্বজন না হয় বা জাগতিক কোন উদ্দেশ্য না থাকে বরং নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের আশায় অতিথিসেবা করা হয়, তখন সেই আতিথিয়েতা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দ্বিগুণ প্রতিদান বয়ে আনে।

যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমেও আতিথেয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বর্ণনা করে বলেছেন, অতিথি আগমনের সাথে সাথেই তিনি যে কাজটি করেছেন, তাহলো, তাদের সামনে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রথম যখন ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তাঁর মাঝে ভীতির সঞ্চার হয়। তখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.)-কে তিনি (সা.) সব কিছু বলেন, খাদীজা (রা.) তাঁর কথা শুনে তাৎক্ষণিক ভাবে তাঁর সেসব গুণের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, এমন গুণাবলীর আধিকারীকে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে ব্যর্থ করতে পারেন বা তাঁর প্রতি কীভাবে অসন্তুষ্ট হতে পারেন? সেগুলোর মধ্যে থেকে অতি উৎকৃষ্ট যে বৈশিষ্ট্য বা গুণের কথা বলেছিলেন তাহলো, মহানবী (সা.)-এর আতিথেয়তা' ।

'অতএব, আতিথেয়তা কোন সাধারণ বিষয় নয়। এটি নবীদের অন্যতম একটি গুণ এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বিশেষভাবে যেসব কাজ দেয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, আতিথেয়তা। আর তাঁকে বলা হয়েছে, বিচলিত ও ক্লান্ত হয়ো না' .....'মহানবী (সা.) বলেছেন, *'তোমরা তোমাদের অতিথির যথাযথ প্রাপ্য প্রদান কর'*। তিনি (সা.) বলেছেন, *'মেহমান নেওয়াযী তিন দিনের অথবা স্বল্প দিনের মেহমান নেওয়াযী হয়। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর নিজের মেহমান নেওয়াযীর মাপকাঠি কি ছিলো? সামান্য কয়েক দিনের মেহমান নেওয়াযী ছিল না। বরং চিরস্থায়ী মেহমান নেওয়াযী হয়ে থাকতো'*। অতিথিসেবার দায়িত্ব মহানবী (সা.) নিজেই পালন করতেন।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) কর্তৃক এক বর্ণনায় এসেছে,....একবার কয়েকদিন না খাওয়ার কারণে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। সে সময় হযরত নবী করীম (সা.) তার অবস্থা দেখেন এবং ঘরের মধ্য থেকে একটি দুধের বাটি নিয়ে আসেন (কোথায়ও থেকে দুধটুকু কেউ উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন) তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)-কে বললেন, *'যাও যতজন আসহাফে সুফফা আছেন, সবাইকে ডেকে নিয়ে আসো। আমরা ৭/৮ জন ছিলাম, সবাই গোল হয়ে বসলাম, ঘটনাক্রমে হুযূর (সা.) আমাকে বললেন, ডান দিক থেকে দুধ পান করাতে শুরু কর। আমি ভাবলাম, শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যে কিছুই জুটবে না। একে একে সবার পরে আমার পালা এল।*

হুযূর (সা.) যেহেতু পূর্বেই পেয়ালা থেকে এক বা দুই চুমুক পান করেছিলেন, এবার বললেন, আবু হুরায়রাহ্, তুমি পান কর! আমি পেট পুরে পান করলাম হুযূর (সা.) বললেন, আরো পান কর। এরপর আমার মনে হলো আমার হাত পা ফুলে উঠছে। আর পান করতে পারব না। অবশেষে হুযূর (সা.) অবশিষ্ট দুধ পান করলেন'.... আজ এ ধরনের স্থায়ী মেহমান আমাদের নিকট নেই, কিন্তু ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বা ধর্ম শিক্ষার জন্য আগমনকারী মেহমানদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে এজন্য তাদের পূর্ণ মেহমান নেওয়াযী করা আমাদের জন্য ফরয বা আবশ্যক।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, *'আমি সর্বদা সতর্ক থাকতাম, যেন মেহমানদের কোন কষ্ট না হয়। বরং সর্বদা মেহমানগণের সাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ প্রদান করি। মেহমানগণের মন আয়নার মত নাযুক হয়ে থাকে, যা সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে যায়'*। (খুতবা-হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ৩১/৮/২০১২)।

খলীফাতুল মসীহ্দের 'মেহমান নেওয়াযী' বা মেহমানদের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ ভালবাসা ও ব্যবহারের ঘটনাবলী জলসার সময় বর্ণনা করেন। এই নসীহত কি শুধুমাত্র জলসার দিনগুলোর জন্য বা যেখানে জলসা হচ্ছে, সেখানকার আয়োজনকারীদের জন্য? খলীফাতুল মসীহ্ বলেন, *'আমি যখন কোন দেশের বা কোন জাতির অথবা সংগঠনের উদ্দেশ্যে কোন কথা বলে থাকি, তা বিশ্বের সকল আহমদীর জন্য সমানভাবে প্রজোয্য হবে'*। যদি খলীফাতুল মসীহ্ এভাবেই আমাদের সকলকে আহবান করে থাকেন, তাহলে আমি বা আমরা বিশ্বের যেখানে আর যে অবস্থায় থাকি না কেন, এই আহবানটি সকল আহমদীকে তাদের নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়কার বিভিন্ন ঘটনা হাদীস থেকে জানা যায়। 'একবার হুযূর (সা.)-এর দরবারে

এক মেহমান আসলো, হুযূর (সা.) সাহাবী (রা.)-দের উদ্দেশ্যে বললেন, কে আছ যে, এ মেহমানকে তার বাড়ীতে নিয়ে যাবে ? এক সাহাবী বললো, হুযূর! আমি নিব। সাহাবী নিঃশঙ্কচিত্তে সেই অতিথিকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, *'ঘরে খাওয়ার কি আছে ? স্ত্রী বললেন, শুধুমাত্র বাচ্চা দু'টির জন্য অতি সামান্য খাবার আছে, আমাদের দু'জনের জন্য কিছুই নেই।*

আতিথেয়তা কোন সাধারণ বিষয় নয়। এটি নবীদের অন্যতম একটি গুণ এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বিশেষভাবে যেসব কাজ দেয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, আতিথেয়তা। আর তাঁকে বলা হয়েছে, বিচলিত ও ক্লান্ত হয়ো না' ....

'মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের অতিথির যথাযথ প্রাপ্য প্রদান কর'। তিনি (সা.) বলেছেন, 'মেহমান নেওয়াযী তিন দিনের অথবা স্বল্প দিনের মেহমান নেওয়াযী হয়। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর নিজের মেহমান নেওয়াযীর মাপকাঠি কি ছিলো? সামান্য কয়েক দিনের মেহমান নেওয়াযী ছিল না। বরং চিরস্থায়ী মেহমান নেওয়াযী হয়ে থাকতো' অতিথিসেবার দায়িত্ব মহানবী (সা.) নিজেই পালন করতেন।

সাহাবী (রা.) স্ত্রীকে বললেন, বাচ্চাদের কোনভাবে ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর খাবারটি আমাদের সামনে নিয়ে আসার পর কৌশলে বাতি নিভিয়ে দিবে। বাতি আনতে আনতে আমি খাওয়ার ভান করবো আর এ ফাঁকে অতিথিকে খাওয়ার সুযোগ করে দিব'। কথা অনুযায়ী কাজ হলো। পরদিন সকালে সাহাবী (রা.) অতিথিকে নিয়ে হুযূর (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তখন হুযূর (সা.) সেই সাহাবীকে দেখে খুবই হাসছিলেন। সাহাবী (রা.) হুযূর (সা.)-এর হাসির কারণ জানতে চাইলে মহানবী (সা.) বলেন, গত রাতে তোমার বাড়ীতে যে ঘটনা ঘটেছে, সেজন্য 'স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা হেসে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, তাই তিনিও হাসছেন! এটি হলো, ইসলামের সে যুগের অসংখ্য ঘটনার একটি মাত্র উদাহরণ। একবার রসূলে করীম (সা.)-এর বাড়ীতে এক ইহুদী অতিথি হিসাবে রাত্রি যাপন করে। বিছানা নষ্ট করে রাতের অন্ধকারেই সে পালিয়ে যায়। সকালে হুযূর (সা.) মেহমানের ঘরে গিয়ে দেখেন, সে (মেহমান) ঘরে নেই এবং বিছানা নোংরা হয়ে আছে।

মহানবী (সা.) এটি দেখে খুবই কষ্ট পান এবং মনে মনে বলেন, অতিথি রাতে কতই না কষ্ট পেয়েছে। হুযূর (সা.) নিজ হাতেই সে বিছানা পরিষ্কার করছিলেন। সাহাবারা (রা.) বলেন, হুযূর ! আমাদের দিন, আমরা এটি পরিষ্কার করে দেই। কিন্তু, হুযূর (সা.) বলেন, মেহমান আমার, আমাকেই এটি পরিস্কার করতে দিন। এমনি সময় সে বেদুইন ফিরে আসলো। সে (ইহুদী) ভুলে ফেলে যাওয়া তলোয়ার নিতে ফিরে আসে। এসে দেখে, বিশ্বনবী মহানবী (সা.) নিজেই তার নোংরা করা বিছানা পরিষ্কার করছেন, আর রাতে অতিথির কষ্ট হয়েছে মনে করে আক্ষেপ করছেন। এ যুগেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সময়কার বহু ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা আছে; কাদিয়ানে প্রায়শঃ অতিথি আসতেন এবং তাদের সব রকমের খোঁজ-খবর স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই রাখতেন। রাতে তারা খেয়েছে কি-না, তাদের বিছানাপত্র আছে কি-না, ইত্যাদি-ইত্যাদি। কখনো কখনো হুযূর (আ.) নিজের ঘর থেকে লেপ, কম্বল দিয়ে মেহমানদের শীত নিবারণের ব্যবস্থা করতেন। ঘর থেকে নিজ হাতে তিনি মেহমানদের জন্য দুধ এনে তাদের আপ্যায়ন করতেন।

হযরত আম্মাজান একাজে সার্বক্ষণিক মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সাহায্য করতেন। (সীরাতুল মাহদী-১ম খন্ড, ১৪৭-১৪৮ পৃঃ হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম,এ,প্রণীত) ইতিহাস বলে, সেই যে 'মেহমান নেওয়াযী' শুরু হলো, আজ বিশ্বব্যাপী দু'শতাধিক দেশে শত শত লঙ্গরখানা থেকে হাজার-হাজার লোক প্রতিদিন আপ্যায়িত হবার সুযোগ পাচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিসেবা বা মেহমানদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যার মধ্য হতে খলীফাগণ বিভিন্ন সময় ২/১টি খুতবায় উল্লেখ করেন। দ্বিতীয়টি হলো, মানুষের বা সৃষ্টির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আন্তরিক ভালবাসা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্যই। আর তৃতীয়টি হলো, প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে নিজেদের মগ্ন হবার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করা। মোটামুটি এ তিনটিই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মূল বিষয় বলে আমি মনে করি।

উপরোক্ত তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু আন্তরিক। আমরা সবাই কিছুটা আত্মবিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাব, কি কারণে আমাদের মধ্যে 'ভ্রাতৃত্ব বন্ধন' শিথিল হচ্ছে। কেউ হয়তো বলতে পারে, বর্তমানের আর্থিক অবস্থা ভালো না! ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবীদের অনেকেই ছিলেন একেবারে রিক্ত-নিঃস্ব, তাদের চেয়ে আমাদের আর্থিক অবস্থা অনেক-অনেক গুণ ভালো নয় কী? কিছুই নেই, শুধুমাত্র ২টি বাচ্চার খাবার দিয়েই মেহমানকে খাওয়ানো, এক বাটি দুধ দিয়ে ৭/৮ জনের পেট ভরানো। এটি কীভাবে সম্ভব? সম্ভব হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা ও খোদার সাহায্যের কারণে। বর্তমানে আমরা যে অভাব-অনটনের কথা বলি তা ইসলামের প্রাথমিক যুগের অভাবের তুলনায় খুবই কম।

হিযরতের পর মহানবী (সা.) মক্কার মুহাজিরদেরকে মদীনার আনসারদের 'ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন' করে দিয়ে যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, সেই ইতিহাস-কি আমরা ভুলে গেছি! এ শিক্ষা চিরস্থায়ী শিক্ষা । এ শিক্ষা সর্বকালের, সকল যুগের (*সূরা আল ইমরান আয়াত-১০৫*) । হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সে পুরোনো শিক্ষাই পুনঃরায় প্রতিষ্ঠা করতে বয়'আতের শর্তে যোগ করেছেন । যা মানুষ ভুলে গেছে। আমরা যেন ভুলে না যাই তাই যুগ ইমাম আমাদের সময়ে সময়ে স্মরণ করিয়ে দেন ।

আমরা যদি নতুন বয়'আতকারীদের সাথে এবং অন্যান্য আহমদী, এমনকি পরিচিত-অপরিচিত সবার সাথে নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি করতে আন্তরিক হই, মোটকথা, সকলের সাথে আত্মীয়সুলভ ব্যবহার করি, এর পাশাপাশি যদি নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী– কারো বা জামাতের সাহায্য ছাড়া প্রত্যেক আহমদী ব্যক্তিগত উদ্যোগে যার যা আছে তাই দিয়ে দূর থেকে আগত অতিথির আপ্যায়নের ব্যবস্থা করি, (এবং তা আজীবন করতে হবে)। পরিবারের সদস্যরা যারা অতিথি আপ্যায়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন তাদের বুঝাতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা যাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন, তারাই অতিথিসেবার সুযোগ পান। এ সুযোগ যেন কেউ হাতছাড়া না করেন।*'ফাস্তাবিকুল খায়রাত'* সৎকাজে প্রতিযোগিতা করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন। আবার বলেছেন, *'কু আনফুসাকুম ওয়া আহ্‌লিকুম নারা'* অর্থাৎ, ***'নিজে আগুন থেকে বাঁচো এবং পরিবার-পরিজনকেও আগুন থেকে বাঁচাও'।*** অতিথি আপ্যায়নের জন্য এই দুনিয়াতে আগুনের ব্যবহার পরকালের আগুন থেকে রক্ষার উপায় হতে পারে। মহানবী (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.) অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে স্বয়ং নিজ হাতে আপ্যায়ন করতেন। অতএব, আমরা উম্মত ও অনুসারী হয়ে কেন তা পারব না !

অতিথি আপ্যায়নে সামর্থের অভাব থাকলে, সামর্থের জন্য সকল অভাব পূরণের একমাত্র মালিক আল্লাহ্, বার বার দানকারী। আল্লাহ্ তা'লার কাছেই সামর্থ অর্জনের জন্য চাইতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের বাসনায় কারো হাতকে তিনি খালি ফিরিয়ে দেন না। মনে রাখবেন, সর্বদা 'তাওয়াক্কুল ইলাল্লাহ্' বা আল্লাহ্ তা'লার উপর নির্ভর করতে হবে, মানুষের উপর নয়। তাহলে আমার মনে হয় না, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের শর্ত আরোপ করেছেন তা আর শিথীল হবে না।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ***"লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসুলিল্লাহে উস্‌ওয়াতুন হাসানা"***(সূরা আল্ আহযাব: ২২) অর্থাৎ, ***'নিশ্চয় তোমাদের এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে উৎকৃষ্ট আদর্শ রয়েছে'।*** কিন্তু, মানুষের স্বভাব হচ্ছে; সে চাক্ষুস আদর্শ দেখতে চায়। এজন্য প্রত্যেক আহমদীকে 'একজন আদর্শ'রূপে জীবন-যাপন করা উচিত। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, জামাতের কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাবৃন্দের স্থানীয় জামাতগুলিতে সফরকালীন সময় তাদের মেহমান নেওয়াযীর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, এ প্রতিযোগিতাটি যদি জামাতের দূর-দূরান্ত থেকে আগত সাধারণ ও গরীব আহমদীদের জন্য করা হয় তাহলে তাই হবে প্রকৃত মেহমান নেওয়াযী। এর উপরই জোর দেয়া উচিত।

আলোচ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের প্রত্যেক আহমদীর বাসা-বাড়ী হবে 'মিনি কাদিয়ান'। এসব বাসা-বাড়ীতে এসে যেন লোকেরা বুঝতে পারে, ইসলামের সৌন্দর্য, ইসলামের সুমহান শিক্ষা, প্রত্যেক মুসলমান ভাই-ভাই এবং ইবাদতের নেক নমুনা এখানে দৃশ্যমান হবে। এছাড়া, বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহারে অতি অল্প খরচে মোবাইলের মাধ্যমে যার যতটুকু সম্ভব, তার আওতাধীন নতুন ও পুরাতন আহমদীদের খোঁজ-খবর মাঝে-মাঝে নিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এসব কার্যক্রম জারী আছে। তবে, এটি ব্যাপকভাবে সকল আহমদীর বাসা-বাড়ীতে শুরু হলে আশা করা যায় বাংলাদেশে নতুনভাবে আহমদীয়াতের জাগরণ সৃষ্টি হবে।

কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে, এসব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যা করার, তা তো জামাতই করছে। জামাতের কাজ, জামাতের কর্মকর্তারা করছেন, সেটি ভিন্ন বিষয়। আলোচ্য বিষয়টি ব্যক্তি জীবনে আমল করে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সন্তুষ্টি অর্জনের সহজ পথের অন্বেষণ করা। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভে সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই এ লেখার অবতারণা। ***'ওয়াযাক্কের্, ফাইন্নায যিক্‌রা তানফাউল মু'মিনীন'*** অর্থাৎ, ***'আর তুমি উপদেশ দিতে থাক। নিশ্চয় উপদেশ মু'মিনদের কল্যাণ সাধন করে'*** (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৬)।

মহান আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন, ***'তার জন্য এ জগতে এবং পরকালে রয়েছে মহা পুরস্কার আর আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না'।***

আল্লাহ্ তা'লার হয়তো এই খিদমতের বা অতিথি সেবার জন্য আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ***'সুতরাং যে এক অণু পরিমাণ পুণ্যকর্মও করেছে তা (সে) দেখতে পাবে'*** (সূরা আয্‌যিল্‌যাল:৮)।

অন্যদিকে যারা এমন পূণ্যকর্ম করেছে, তাদের এ জগতেও অনেক পুরস্কার দিয়েছেন, এর বহু উদাহরণ আমাদের সামনেই রয়েছে। নিশ্চিত করে বলতে পারি, এর ফলে কোন আহমদী, নতুন হোক বা জন্মগত, সকলের মধ্যে বয়'আতের দশম শর্ত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে এবং সাথে সাথে তবলীগের পথ প্রশস্ত হয়ে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির কারণ হবে। আসুন! মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যবহারিক জীবনের আলোকে ও যুগ খলীফাদের দিক-নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের নবাগত বা জন্মগত, সকল আহমদীর সাথে ঐ আচরণই করবো, যা আমাদের করতে বলেছেন। ফলশ্রুতিতে আর কেউ হারিয়ে যাবে না। একই সঙ্গে সকল পরিবারে নতুন প্রজন্মসহ তালীম-তরবীয়তের প্রেরণা যোগাবে, নতুন বয়আতকারীর সংখ্যাও বাড়তে থাকবে।

আমরা সকলে যাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা ও খলীফাতুল মসীহ্‌র উপদেশসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারি, সেজন্য আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'লার আমাদের সকল দুর্বলতা দূর করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের সকল পথ প্রশস্ত করুণ। আমীন।

e-mail:majalilsavar@gmail.com

দোয়ার আবেদন

আমাদের ৩য় মেয়ে সাদিয়া নাছরীন শম্পা এবং জামাতা মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন পিন্টুকে বিগত ২৭/১১/২০১২ইং তারিখে আল্লাহ্ তাআলা এক পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের মেয়ে জামাই এবং নাতীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং তারা যেন সারা জীবন আহমদীয়াতের সেবা করে যেতে পারে সেজন্য সকলের নিকট খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল মাষ্টার
ও রোকেয়া বেগম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৫ম কিস্তি)

মোহাম্মদ ওসমান গনি

১৯৬৩ সালের ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ৪৪তম জলসাটি ছিল গনি সাহেবের জীবনের শেষ প্রাদেশিক জলসা। এ জলসার সার্বিক সফলতায় তিনি অন্যান্যদের সাথে দিবারাত নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্দেশে তৎকালীন সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়ার সাহেবজাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.), (যিনি পরবর্তীকালে তৃতীয় খলীফাতুল মসীহ্‌র মসনদে সমাসীন হয়েছিলেন), ছয় সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদলসহ ঢাকায় আগমন করেন। এ প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন– (১) মোহতরম শেখ বশির আহমদ (লাহোর হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি), (২) মোহতরম আবুল আতা জলন্ধরী (সম্পাদক আল ফুরকান এবং মিশর ও প্যালেস্টাইনের সাবেক মোবাল্লেগ), (৩) মোহতরম শেখ মোবারক আহমদ (ইংল্যান্ড ও আফ্রিকার মোবাল্লেগ), (৪) মোহতরম চৌধুরী জহুর আহমদ এবং (৫) মোহতরম মাহমুদ আহমদ আনোয়ার হায়দ্রাবাদী। তাদের আগমনে ৪৪তম সালানা জলসা সরগরম ও আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে।

ধর্মের জন্য নিবেদিত-প্রাণ উত্তম-খাদেম ওসমান গনি সম্মানিত বুযুর্গদের সান্নিধ্যে তাদের অমূল্য ভাষণ ও নসিহত শুনে একদিকে আবেগাপ্লুত হন, অপরদিকে তাদের সেবার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথার্থ ভাবে পালনে তাদের স্নেহস্পর্শ ও দোয়া লাভে সৌভাগ্যবান হন। ঐশী নূরের আলোকে আলোকিত হয়ে যান। এইরূপ বান্দাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–যে কেউ ভাল কাজ করবে, তাকে এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেওয়া হবে (সূরা আল কাসাস ২৮ : ৮৫)। তিনি যাকে চাহেন আপন রহমতের জন্য বিশেষভাবে বেছে নেন এবং আল্লাহ্ মহা-কল্যাণের অধিকারী (সূরা আলে ইমরান ৩ : ৭৫)। ওসমান গনি ফেরেশ্‌তাতুল্য এই বুযুর্গদের সেবায় আল্লাহ্ তাআলার সেই রহমত ও ফজলের অধিকারী হয়ে ছিলেন।

প্রাদেশিক জলসার পর সাহেবযাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) এর নেতৃত্বে আগত সম্মানিত অতিথিগণ এদেশের প্রাচীনতম জামাত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সফর করেন। তাদের নিরাপত্তা ও সেবায় গনি সাহেব সাথে ছিলেন। এই মহীয়ান অতিথিরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলষ্টেশনে পৌঁছলে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন সাহেব এবং অন্যান্য সদস্যরা প্রাণঢালা সাদর-সম্বর্ধনা জানান। ট্রেন থেকে অবতরনের সঙ্গে সঙ্গে গগণবিদায়ী শ্লোগানের মাধ্যমে প্রিয় অতিথিদেরকে বরণ করে নেন। ষ্টেশন থেকে বিরাট মিছিল করে মৌলভীপাড়া মসজিদুল মাহদীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সাহেবযাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) আহমদীদের উদ্দেশ্যে এক হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দান করেন। ধর্মের জন্য কুরবানীর বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এখনও এ অঞ্চলে কেউ সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেনি। সুতরাং চরম ত্যাগের স্বাদ থেকে এ অঞ্চল এখনও বঞ্চিত'। হুযূর (রাহে.)-এর সেদিনের এ অভিব্যক্তি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন তাদের খেদমতে নিবেদিত যুবক ওসমান গনি। তাঁর মনের সাগরে ঐশী প্রেমের প্রেরণায় অনুভূত হয়, হায়রে! আমি যদি এ অঞ্চলে জীবন উৎসর্গ করার মাধ্যমে সেই চরম ত্যাগের স্বাদ লাভ করতে পারতাম। আকাশের লিখন তাঁর ভাগ্যেই নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ্ তাআলা এক মাসের মধ্যে তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ করেন। তিনি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ক্রয়ে নিজেকে সোপর্দ করে জীবন বিক্রয় করে দেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে শহীদের অমূল্য পুরস্কার দানে তাঁর জীবন ক্রয় করে নেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–'তুমি বল! নিশ্চয় আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই ধর্মে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করি। আর আমাকে এও আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন সব আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম হই' (সূরা আয্‌যুমার ৩৯ : ১২-১৩)। ওসমান গনি আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য স্বীকারের আদেশ পালনে জীবন দান করে আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম হন।

দ্বিতীয় আঞ্চলিক ইজতেমা

আহমদীয়া জামাতের খেদমতে নিবেদিত এক ব্যক্তি ছিলেন আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। তিনি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার রিজিওনাল কায়েদের দায়িত্ব পালন করেন। তখন তিনি জামাতের বাঙালি যুবকদের জামাতী তালিম তরবিয়তে চাঙ্গা করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৬২ সালের ৪-৫ নভেম্বর প্রথম রিজিওনাল ইজতেমার আয়োজন করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের লোকনাথ টেঙ্কের পাড়ে অনুষ্ঠিত এই ইজতেমায় এদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক খাদেম ও তিফল যোগদান করেছিলেন। রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেব। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পৌত্র এবং হযরত

খলীফাতুল মসীহ্ (রা.)-এর পুত্র। ফলে বাঙালি খোদ্দাম ও আতফালের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ইজতেমা আনন্দঘন পরিবেশে সরগরম হয়ে উঠে। ঐশী প্রেমিকদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। আর এর সফলতায় রিজিওনাল কায়েদ সাহেবের সাথে যারা নিরলস দিবারাত পরিশ্রম করেছেন তাদের মধ্যে একজন জামাতের নিবেদিত খাদেম ওসমান গনি। তিনি সৈনিকের চাকুরি কালে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত খোদ্দামের ইজতেমায় যোগদান করে যে শিক্ষা ও তালিম তরবিয়ত লাভ করেছিলেন, এর আদলে বঙ্গভূমিতে অনুষ্ঠিত ইজতেমাকে রিজিওনাল কায়েদ সাহেবের সহযোগিতায় সতীর্থ বন্ধুদের নিয়ে ঢেলে সাজায়ে তোলেন। ফলে ইজতেমা সার্বিকভাবে সার্থক সফল ও প্রাণবন্ত হয়। তখন গনি সাহেব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ঢাকার তবলীগ সেক্রেটারী ও পাক্ষিক আহমদীর ম্যানেজারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অনুরূপভাবে পরবর্তী বছর ২-৩ নভেম্বর ১৯৬৩ তারিখ একই স্থানে দ্বিতীয় রিজিওনাল ইজতেমার আয়োজন করা হয়। এই ইজতেমাকে আরও জামজমকভাবে সার্থক ও সফল করে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থানীয় কায়েদ জনাব ফরিদ আহমদ, মোহাম্মদ ইদ্রিস, শহিদুর রহমান প্রমুখের সাথে ওসমান গনির উপর ব্যবস্থাপনার কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্রোগ্রাম হয় ইজতেমার দুইদিন পূর্বে ওসমান গনি রিজিওনাল কায়েদ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের সাথে ইজতেমার জন্য তাবুসহ বিভিন্ন মালামাল নিয়ে ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবেন। ইজতেমা ও জলসার ব্যবস্থাপনায় তিনি কাজ করবেন এবং কর্মসূচি সমাপ্তির পর মালামাল তিনি পুনরায় ঢাকায় নিয়ে আসবেন। এ তাবুগুলি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী এক আহমদী ব্যবসায়ী ভ্রাতার।

সেজন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে একনিষ্ঠ খাদেম ওসমান গনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু জনাব শহিদুর রহমানের নিকট ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পত্রে লিখেন– 'ভাই সাহেব! এবারে ইজতেমা আরও জাকজমকভাবে আয়োজন করতে হবে। ঢেলে সাজায়ে তোলতে হবে এবং অধিক সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফালের উপস্থিতির ব্যবস্থা করবেন। আমি অনুষ্ঠানের দুই দিন পূর্বে তাবু নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছবো (ইনশাআল্লাহ্)'। তাই মালামালগুলি বকশীবাজারে প্রস্তুত রেখে নিজের প্রয়োজনীয় কাপড় ও মাতা-পিতার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আসার জন্য তিনি নিজ বাড়ি মানিকগঞ্জ যান।

৩১ অক্টোবর ১৯৬৩ তারিখ বৃহস্পতিবার ভোরে ফজর নামায আদায়ের পর ঢাকায় আসার জন্য প্রস্তুতি নেন। আদরের ছোট বোন সুফিয়া বেগমকে বলেন–'আমার জন্য কয়েকটি আটার রুটি ও হালুয়া তৈরী করে একটি রুমালে বেঁধে দাও। দুপুরে খেতে হবে।' তাঁর ব্যবহৃত লাল ও ধুসর রঙের সুটকেসটিতে নিজেই প্রয়োজনীয় কাপড়, একটি প্লেইট ও একটি গ্লাস গোছিয়ে নেন। কিন্তু প্রকৃতি বৈরী হয়ে উঠে। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। সাথে ঝড়ো হাওয়া। ঘর থেকে বের হওয়া দায়। মাতা-পিতা এ অবস্থায় ঘর থেকে বের হতে বারণ করেন। কিন্তু ঐশী জামাতের ডাকে জান, মাল, ইজ্জত, ও সময় কুরবানীর জন্য সদা প্রস্তুত ওসমান গনিকে রুখবে কে? সবই তুচ্ছ খোদার রাহে ছাড়া। প্রয়োজনে মসীহের জামাতের ডাকে বরফের পাহাড় হামাগুড়ি দিয়ে পাড় হতেও ব্যাকুল তিনি। তাই পিতাকে তিনি বলেন–'ইজতেমার বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব আমার উপর। রিজিওনাল কায়েদ সাহেব আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। তাঁর সাথে আজকেই আমাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেতে হবে। তাই দুপুরের মধ্যে ঢাকাস্থ বকশীবাজার দারুত তবলীগে পৌঁছতে হবে'। ছোট ভাই বোনরা আগলে ধরে বলেন–'ভাইজান আপনি কবে আসবেন'। তখন তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলেন–'ইজতেমা ও জলসার পর আগামী মঙ্গলবার চলে আসবো ইনশাআল্লাহ্। দোয়া করিও'। এ বলে সালাম দিয়ে আল্লাহ্‌র নামে অঝোর বৃষ্টির মাঝে সুটকেস ও ছাতা হাতে ঘর থেকে বের হন। ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে নির্ধারিত সময়ে দারুত তবলীগে পৌঁছেন এবং সে দিন বিকালে গ্রীন এরো ট্রেনে রিজিওনাল কায়েদ সাহেবের সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে যান। তখন আলিমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া কেউ জানত না খোদার রাহে ঘর ছাড়া এ ছেলে আর মাতৃকুলে ফিরে আসবে না। ঢাকার দারুত তবলীগ তার পদচরণে আর মুখরিত হয়ে উঠবে না। জামাতের বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের ব্যবস্থাপনায় তাঁর উদ্দম ও সাধনা আর পরিলক্ষিত হবে না। তিনি শহীদের পুরস্কার লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। শহীদের মুকুট লাভের সৌভাগ্যবান হবেন। আকাশের লিখন তাঁর ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন–অদৃশ্যের বিষয়াবলীর চাবি তাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া তা কেউ জানেন না এবং জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন (সূরা আল্ আনআম ৬ : ৬০)। যে-ই আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ চায় তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় নিশ্চয় আসবে। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ (সূরা আল্ আন্‌কাবুত ২৯ : ৬)।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রাণ-কেন্দ্রে অবস্থিত লোকনাথ টেঙ্কের পাড়। এটা রিপাবলিক স্কয়ার নামেও পরিচিত। বিরাট দীঘির দক্ষিণে সানবান্ধা পাকা ঘাট। স্বচ্ছ কালো জলে ভরা দীঘি। দীঘির দক্ষিণে মাঠ। মাঠের পশ্চিমে পুকুর। মাঠের বিভিন্ন স্থানে শতবর্ষী বড় বড় কয়েকটি লেম্ভী গাছের ছায়া যেন পথচারীকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ক্লান্ত দুপুরে পথিক বিশ্রাম নেয়। একটু প্রশান্তি পায়। এমন মন মুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের মাঝে ঐশী প্রেমিকদের মিলন মেলার আয়োজন। গত বছর প্রথম আঞ্চলিক ইজতেমা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে স্থানীয় জামাতের অনেকগুলি সালানা জলসাও এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার ইজতেমার পর জলসা হবে। উপরন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদীরা এখানেই ঈদের নামায পড়ে। মাঠে পর্দার বেষ্টনী দিয়ে নারী পুরুষের পৃথক নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে সরকারি মালিকাধীন এ স্থানটি আশেকে মসীহদের পদচারণায় ধন্য। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বংশোদ্ভুত পৌত্র সাহেবযাদা হযরত মির্যা রফি আহমদ সাহেবসহ কাদিয়ান ও রাবওয়া থেকে আগত অনেক বুযুর্গের চরণধূলি পড়েছে এখানে। তাদের দোয়ায় লোকনাথ টেঙ্কের পাড় সিক্ত। পুণ্যাত্মার ব্যক্তিদের সাথে ফেরেশ্‌তারা বিচরণ করে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–আকাশের প্রত্যেক বস্তু যেমন খোদা তাআলার গৌরব ও পবিত্রতা ঘোষণা করছে, তদ্রূপ এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুও তাঁর গৌরব ও পবিত্রতার ঘোষণা করছে (সূরা আল্ জুমুআ ৬২ : ২)। তাই খোদা তাআলার গুণ কীর্তনের জন্য আশেকে মসীহরা ইজতেমা ও জলসার আয়োজন করে।

(চলবে)

আমার বয়আত গ্রহণ ও ঐশী নিদর্শন

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান

(শেষ কিস্তি)

পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ কেবল পাঠ করেছি, এর মধ্যেই দেখি, আমার ঘরে এলাকার লোকজন এসে ভর্তি হয়ে গেল, আর বাড়ির ভিতরে গ্রামের মহিলারা এসে ভর্তি হয়ে গেল। সবাই এসেছে আমাকে কি ধরণের শাস্তি দেয়, তা দেখার জন্য। এমন অবস্থায় আমার জিহ্বা, মুখ, শুকিয়ে যায়। মনে মনে কলেমা পড়ছি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করে একবার পড়ে নিলাম লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তুমিনায যোয়ালেমিন। এমন বিপদের সময় আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত আমার উপর নাযিল হয়। তাদের মধ্য হতে একজন কিছুটা আমার পক্ষে দাঁড়ালো। সে বলল, হেলাল, আমরা কেন এসেছি তুমি তো জান? সে বলল, তুমি যে কাদিয়ানী হয়েছ এজন্যই এসেছি। আমি চুপ রইলাম। তখন সে বলল, তোমার কোন ভয় নেই, তবে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। যদি তুমি সঠিক ভাবে যুক্তি-প্রমাণ ও দলীল দিতে পার, তাহলে কেউ তোমাকে মারতে পারবে না, আর মারতে হলে আমার লাশের উপর দিয়ে গিয়ে মারতে হবে। তখন আমি কিছুটা সাহস পেলাম। আমি বললাম, আপনারা আমাকে একশত প্রশ্ন করবেন, আমি সকল প্রশ্নের উত্তর দিব, যদি কোন একটি প্রশ্নের উত্তরও দিতে না পারি, তাহলে আহমদীয়াত ছেড়ে দিব। কিন্তু আমিও আপনাদেরকে একশত প্রশ্ন করব, যদি একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারেন, আর ৯৯টির উত্তর দিতে না পারেন, তবুও আমি আহমদীয়াত ছেড়ে দিব। আর যদি একটিরও উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে আমার কোন দোষ থাকবে না, আমি আহমদী থাকব।

এ নিদারুন-অসহায় অবস্থায় সম্পূর্ণ তাদের পক্ষে শর্ত দিয়ে শুরু হল, এক দুই করে কথা। তাদের মধ্যে তিন জন মৌলভী ছিল, তারা বলল, তুমি কেন কাদিয়ানী হলে? আমি বললাম, কুরআন ও হাদীসে আছে, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এ যুগে আসবেন। ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে গুরুদাসপুর জেলায় কাদিয়ান নামক গ্রামে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব নামে এক ব্যক্তি এ যুগের ইমাম মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করেছেন। আমি কুরআন ও হাদীস দেখে তাঁর উপর ঈমান এনেছি। আমি বাঙালি এবং মুসলমান, আমার ধর্ম ইসলাম, আমি আহমদী, আমি কাদিয়ানী নই। তাদের আলেমগণ বললেন, খাতামান নবীঈন-এর পরে আর কোন নবী নেই, একথা কি তুমি জান না? আমি বললাম, আগে জানতাম, কিন্তু এখন জানি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এ উম্মতের মধ্যে 'উম্মতি-নবী' হিসেবে আসবেন এবং এসেছেন। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত একটানা প্রশ্ন-উত্তর চলতে থাকে। আমার সৌভাগ্য যে, সেদিন আমি জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখেছি। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সত্যতার যে উজ্জ্বল-প্রমাণ পেয়েছি, আমার কোন ভাষা নেই, তা প্রকাশ করার। তারা শতাধিক প্রশ্ন করেছে, আমি সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি যথার্থভাবে, একটিরও উত্তর বাদ দেইনি। কিন্তু আমি জানতাম না, এসব প্রশ্নের উত্তর আমি কিভাবে একের পর এক দিয়ে যাচ্ছি। আর আমি যখন তাদেরকে প্রশ্ন করি, তারা তার একটিরও উত্তর দিতে পারে নি। কারণ, কথা ছিল, সমস্ত প্রশ্ন এবং উত্তর হতে হবে কুরআন ও হাদীস থেকে। এখন কুরআন ও হাদীস-উভয়ই সামনের টেবিলে রয়েছে। উত্তর দিলে আমার পক্ষে এসে যাবে, এ-ভয়ে তারা উত্তর দিতে পারেনি। আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো আমাকে দিতে হল। তখন তারা লজ্জায় মাথা নত করে চলে যায়। তখন আমার আব্বা বললেন, ওর সাথে পারবেন না, কারণ, সে এখন শয়তান হয়ে গেছে।

এখন শেষ ফয়সালা হল, আমার আব্বা বললেন, সে যদি আহমদীয়াত ছেড়ে দেয়, তাহলে আমার সম্পদের অংশ পাবে, আর নয়ত সে আমার সম্পদের কিছুই পাবে না, তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আমি বললাম, যে মহান খোদা আজকের এ-কঠিন অবস্থা থেকে সম্মানজনকভাবে আমাকে উদ্ধার করেছেন, সে খোদা কি আমাকে ছেড়ে দিতে পারেন? তোমার সাত ছেলে, সাত মেয়ে, আর ১৭ বিঘা জমি। এর বেশী কিছু নেই। আল্লাহ্‌ সমস্ত পৃথিবীর মালিক, তিনিই একমাত্র রিযিকদাতা। অতএব, তোমাকে ছেড়ে ঐ বড় মালিকের সঙ্গে চলে গেলাম। ***'আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদীর'***-আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপনার মালিক। নিজ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম জনাব আলী মাষ্টার সাহেবের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে সকালে মক্তব, বিকালে দরস, রাতে আরবী আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াই, তবলীগ করি, এভাবে চলে যায় রোযার মাস। এদিকে সমস্ত গ্রাম জুড়ে শুরু হল কথা বলাবলি। এখন গ্রামের নামাযীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক কাদিয়ানী হবে। অতএব, হেলালকে এখানে আর থাকতে দেওয়া যাবে না। শুরু হলো গোপন ষড়যন্ত্র।

গ্রামের লোকজন বলাবলী করছে, আমার আব্বাকে ও ভাইদেরকে ঈদের দিন, ঈদের মাঠে জুতার মালা গলায় দিয়ে হাজার হাজার লোকের সামনে অপমান-অপদস্ত করে বের করে দিবে। যদি এসব থেকে বাঁচতে চায়, তাহলে তার ছেলে 'হেলাল কাদিয়ানীকে' বাড়ি এনে নিজের হাতে মেরে ফেলতে হবে অথবা কাদিয়ানী ছাড়াতে হবে। যারা এ শয়তানী বা উসকানী দিয়েছিল, তারা হল মৌলভী নূরুল ইসলাম, মৌলভী বকুল মিয়া এবং মুন্সি মুখলেসুর রহমান। তাদের উসকানিতে আব্বা আমার ছোট ভাই মোহাম্মদ এবাদ মিয়াকে সকাল সাতটার সময় আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। এই বলে যে, বড় ভাই গোলাপ মিয়া ভীষণ অসুস্থ, দু'জন ডাক্তার বাড়িতে, তোমাকে দেখার জন্য এখনই যেতে বলেছে। একথাগুলো শুনে, আমি মাষ্টার সাহেবের বাড়ীর বেশ কয়েক জনের সাথে বিষয়টি আলোচনা করি। তারা বললেন, আগামী কাল ঈদুল ফিতরের দিন, আপনি অবশ্যই যাবেন, আপনার বড় ভাইকে দেখে আসবেন। আমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আব্বা বড় ভাইয়ের ঘর দেখিয়ে দিয়ে বলল, এ ঘরে যা। আমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। আমার সামনে আব্বা, পিছনে বড় ভাই গোলাপ মিয়া মারতে শুরু করে। তারা কিছুক্ষণ চুপ থাকে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আর বিছানার উপর পড়ে থাকি।

কিছুক্ষণ পর আযানের ধ্বনি কানে আসে। ৪/৫ জন এসে আমাকে বলে, চল মসজিদে যাই, নামায পড়তে হবে। আমি পুকুরে গিয়ে ওযু করতে করতে ইমাম সাহেব নামাযের সালাম ফিরাল। আমি মসজিদে ঢুকে নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছি, আমার সঙ্গের লোকেরা ইমাম সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে যে, আমরা তাকে নিয়ে আসতে আসতে নামায শেষ করলেন কেন? ইমাম সাহেব বলল, এজন্য কি হয়েছে, আমি আবার নামায পড়াব। তখন আমার খুব রাগ হয়, তখন আমি ইমাম সাহেবের কাছে রেগে বলি, এ দলীল আপনি কোথায় পেয়েছেন? ইমাম সাহেব কিছু না বলে চলে গেল। আমি নামাযে দাঁড়ালাম, আমার সঙ্গীরা পিছনে দাঁড়াল, নামাযের সালাম ফিরিয়ে দেখি কেউ নেই সকলেই চলে গেছে। আমি নামায শেষ করে আবার বাড়ি গিয়ে আমার ঘরে শুয়ে পড়ি।

একজন কুরআনের হাফেজ এসে বললো, তুমি খৃষ্টান হলে কেন? আমি বললাম, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিব, তার আগে তুমি বল, হযরত ঈসা (আ.) মৃত না জীবিত। সে বলল, সারা দুনিয়ার মুসলমানরা জানে ঈসা (আ.) জীবিত আকাশে আছেন, তুমি কি তা জান না? আমি বললাম, সারা দুনিয়ার মানুষ আমার ধর্মগ্রন্থ নয়। আমার ধর্মগ্রন্থ হল কুরআন। কুরআনের ৩১টি আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, হযরত মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.) মৃত্যু হয়ে গেছে। অতএব, কুরআনের কথা যে মানবে, সে মুসলমান, আর যে না মানবে, সে-ই খৃষ্টান। এ কথা বলার সাথে সাথে দ্বিতীয় দফা মার শুরু করে। আবার আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। চলে গেল সারা দিন, হল ইফতারের সময়। মসজিদে মাগরীবের আযান হল, আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। তারা আমাকে ইফতার করতে দেয়নি, এমন কি তারা এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত দেয়নি। আব্বা নামাযে যাওয়ার পর আমার কোন এক বোন কোন রকমে এক গ্লাস পানি দেয়। এর পর আমি কোন মতে বন জঙ্গলের পথে মাষ্টার সাহেবের বাড়ির দিকে যেতে থাকি। রাত প্রায় ১টার দিকে মাষ্টার সাহেবের বাড়ি যাই। এই খবর সকালে লোকেরা জেনে যায়, যার ফলে তারা মাষ্টার সাহেবের বাড়ি ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর সেখান থেকে কোন রকমে আমি কটিয়াদি ইজাজুল হক সাহেবের বাড়িতে আসি। এখানে প্রায় ছয় বছর ছিলাম। তার বাড়ীতে থেকে আয়ুর্বেদী ঔষধালয়ে কাজ করার সুযোগ পাই। সেই সাথে কবিরাজ সাহেবের মেঝো ছেলে ডা: খালেদ আহমদ ফরিদ সাহেবের কাছ থেকে হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা লাভ করি। সকালে এ বাড়ির বাচ্চাদের আরবি শিক্ষা দেই।

একবার তবলীগে আশারা চলতে ছিল। তখন আমি তবলীগের উদ্দেশ্যে কটিয়াদী থেকে বের হয়ে কামালিয়াচর যাই। এ গ্রামটি কিশোরগঞ্জের দক্ষিণ দিকে ও বিন্নাটি বাজারের উত্তর পাশের গ্রাম। সেখানে আমার ছাত্র-জীবনের একজন বন্ধু ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে তবলীগ করি। তখন আমার কথা শুনে বন্ধু আবু বক্কর সিদ্দিক ও তার বউ দু'জনেই বয়আত করেন। বর্তমানে তারা জামাতের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখে।

এর কয়েক বছর পর আমি পঞ্চগড়ে বিয়ে করি। পঞ্চগড়ের বিভিন্ন স্থানে তবলিগ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে আমি পঞ্চগড়ের ঝোলই হাটে প্রতিদিন ঔষধের দোকার করি। ডাক্তারি করা অবস্থায় অনেক রুগীর সাথে তবলিগ হয়। নির্ভয়ে তবলিগ করতে পারি, বাজারের অন্যরাও জানেন যে, আমি আহমদী। আহমদীয়া মুসলিম জামাতে বয়আত নেয়ার পর আমি অনেক সত্য-স্বপ্ন এবং আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি। আমি স্বপ্নে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দর্শন লাভ করেছি, আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্।

হযরত খলীফাতুল মসীহর দোয়ার যে প্রভাব, তাও আমি আমার মেয়ের অসুস্থ্যতার সময় উপলব্ধি করতে পেরেছি। মহান খোদা তাআলার কাছে এটাই নিবেদন, তিনি যেন অধমকে মৃত্যু পর্যন্ত এ সত্য জামাতে থেকে যুগ-খলীফার আনুগত্য করার তৌফিক দান করেন।

নবীনদের পাতা-

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর পিতার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

আমরা সবাই হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর কথা জানি। তিনি অনেক বড় একজন মুজাদ্দেদ এবং ওলি-আল্লাহ্ ছিলেন। তাঁর ছোট বেলার সেই ঘটনার জন্য আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তাঁর সেই বিখ্যাত-ঘটনার কথা ইতিহাসে এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, মায়ের আদেশ পালন করতে গিয়ে ডাকাতদের সামনে সত্য-কথা বলেছিলেন। বিপদ মাথার উপর থাকা সত্ত্বেও কোন ক্রমেই মিথ্যা কথা বলেন নি।

তাঁর পিতারও একটি পুণ্যের ঘটনা আমি বর্ণনা করছি : হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর পিতার নাম 'আব্দুস সালেহ্'। তিনি একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। এটি তাঁর জীবনের সেই সময়কার ঘটনা, যখন তিনি বিয়েই করেন নি। একদিন তিনি একটি বাগানের ভিতর দিয়ে কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে গাছের নীচে একটি আপেল দেখতে পান। আপেলটি তিনি হাতে তুলে নিলেন এবং এর কিছু-অংশ খেয়ে ফেললেন। খাওয়ার সময় তিনি মনে মনে ভাবছেন, 'আমি যে ফলটি খাচ্ছি, এটি এই বাগানের মালিকের গাছের ফল হতে পারে, অথবা অন্যকারোও হবে হয়ত'।

যাই হোক, তিনি একথা ভেবে অনুতপ্ত হলেন যে, এটি খাওয়া তার উচিত হয়নি, অথচ তিনি পুরোটা খাননি, সামান্য একটু খেয়েছেন মাত্র। তৎক্ষণাৎ তিনি বাগানের মালিকের কাছে গেলেন আর জিজ্ঞেস করলেন, এই আপেলটি নিশ্চয়ই আপনার বাগানের, আমি এর কিছু-অংশ খেয়ে ফেলেছি, এজন্য আমি খুবই দুঃখিত এবং অনুতপ্ত। আমি এর প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। বাগানের মালিক মনে মনে ভাবল যে, এই ব্যক্তিকে দেখে নেক, পুণ্যবান মনে হচ্ছে একে দিয়ে আমার কাজ হবে। এই বাহানায় বাগানের মালিক বলল যে, তুমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও? ঠিক আছে, তুমি আজ থেকে আমার বাগানে কাজ করবে, পানি দিবে, বাগানের পরিচর্যা করবে, এতেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। দীর্ঘদিন বাগানে কাজ করার পর নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যায়।

বাগানের মালিক বলল, 'তোমার কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, এখন তুমি যেতে পার। তবে শর্ত এই যে, আমার অন্ধ, বোবা, বধির একটি মেয়ে আছে, তার হাত পা দুর্বল। তাকে তোমার বিয়ে করতে হবে। বাহ্যত একথা শোনার পর কেউ বিয়ে করতে চাইবে না, কিন্তু হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর পিতা কিছুক্ষণ ভাবার পর বললেন, আমি যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত করব, এজন্য হোক-না সে, বোবা আর বধির, হোক না সে দুর্বল, আমি কুরবানী করতে চাই। আর তাই আমি তাকে বিয়ে করব। তিনি রাজি হয়ে গেলেন। অনেক জাঁকজমক ও ধুমধামের সাথে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর তিনি স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। স্ত্রীর চেহারা দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন! ভাবলেন, আমি একি দেখছি!! অন্ধ, বোবা, বধির তো নয়ই, বরং অসাধারণ সুন্দরী। তিনি যা শুনেছিলেন, তাথেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন-চিত্র দেখতে পেলেন। শুধু সুন্দরীই নয়, বরং ধার্মিকও। তারপর তিনি বাগানের মালিক অর্থাৎ তাঁর শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি না বলেছিলেন যে, আপনার মেয়ে অন্ধ, বোবা, বধির, হাত-পা দুর্বল, এসবের মানে কি? উত্তরে তিনি বলেন, অন্ধ বলতে সে কখনও খারাপ জিনিস দেখেনি, বোবা বলতে কখনও খারাপ কথা বলেনি, বধির বলতে কখনও খারাপ কথা শোনেনি, আর হাত পা দুর্বলের অর্থ হচ্ছে, কখনও সে মন্দ কাজ করেনি বা করার সাহস পায়নি। এই স্ত্রীর গর্ভে অনেকগুলো সন্তান জন্মলাভ করে, তাদের মধ্যে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) একজন।

এই ঘটনার মধ্যে একটি শিক্ষণীয়-দিক রয়েছে, আর তা হলো, আল্লাহ্ তাআলা সামান্য নেকীকে নষ্ট হতে দেন না। আমাদের দৃষ্টিতে এটি হয়ত একটি সাধারণ বা সামান্য হাজ হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার নিকট অসাধারণ-গুরুত্ব বহন করে। আল্লাহ্ আমাদেরকে বেশী বেশী নেকী করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সংকলন: *মৌ. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান*

পবিত্র কুরআন করীমের আলোকে কৃষি

সৃষ্টি-জগতে কৃষির গুরুত্ব সর্বাধিক। কৃষি শুধুমাত্র পৃথিবীর মানুষের জীবন-ধারনের জন্যই নয়, বরং পৃথিবীর ভ্যবিষ্যতও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কৃষির উপর অনেক দেশের অর্থনৈতিক-উন্নতি নির্ভর করে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কৃষিকে অন্য সকল পেশা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন কৃষক যেভাবে সকাল-সন্ধ্যা শ্রম, মেধা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে, আর যেভাবে খোদা তাআলার কুদরত ও গুণাবলী তার সামনে প্রকাশিত হয়, তা অন্য কোন পেশার লোকদের মাঝে প্রকাশিত হয় না।

আধ্যাত্মিকতাকে সম্মুখে রেখে পবিত্র কুরআন করীম কৃষি ও কৃষি-কাজের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। যেমন-পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–আল্লাহ্ তিনিই, যিনি আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি এর মাধ্যমে রিযক হিসেবে তোমাদের জন্য নানা প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছেন (সূরা ইব্রাহীম : ৩৩)। তদ্রূপ, সূরা যুমারে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–তুমি কি দেখনি, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন? এরপর তিনি স্রোতধারার আকারে একে ভূমিতে প্রবাহিত করেন। এরপর তিনি এর মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করেন। এ ফসলের ভিন্ন ভিন্ন রং হয়ে থাকে। এরপর তা (পেকে বা না পেকে) শুকিয়ে যায়। এরপর তুমি একে হলুদ রং ধারণ করতে দেখ। এরপর তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য বড় উপদেশ রয়েছে (সূরা যুমার: ২২)।

প্রকৃতপক্ষে কৃষি একটি বিজ্ঞান, বরং বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমষ্টি। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কুরআন মজীদ খোদা তাআলার বাণী, আর খোদা তাআলার কাজ হল বিজ্ঞান। খোদা তাআলার কাজ, অর্থাৎ-বিজ্ঞানের মাধ্যমে খোদা তাআলার বাণী অর্থাৎ-কুরআন মজীদের জ্ঞান অধিকতর প্রকাশিত হয়। কৃষিতে ও উৎপাদনে যে উন্নতি হয়েছে, তা কুরআন করীমের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন করীমে বলেন–আর সব কিছু থেকে আমরা জোড়া সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (সূরা যারিয়াত : ৫০)। আরো বলেন–আর এতে প্রত্যেক প্রকার ফল জোড়া জোড়া করে দুই লিঙ্গে সৃষ্টি করেছেন (আর রা'দ : ৪)। আল্লাহ্ তাআলা আবারও সূরা ত্বাহার ৫৪নং আয়াতে বলেন–আর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। এরপর এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের জোড়া উৎপন্ন করেছি।

বিজ্ঞানীরা এই প্রত্যেক প্রকার জোড়া নিয়ে গবেষণা করার পরেই বিভিন্ন ধরনের বীজ ও বিভিন্ন ধরণের চারাগাছ আবিস্কার সফল হয়েছে। খামারে ভুট্টা, গম, কার্পাস, চেরী ফল, প্রভৃতি এই গবেষণার ফলে আবিস্কার হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের বীজের Cross Breed থেকেই এ ধরনের বীজ তৈরী করা হয়েছে, যার কারণে উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কুরআন করীম শুধুমাত্র জ্ঞান ও নীতিই বর্ণনা করেনি, বরং এই সুসংবাদও প্রদান করেছে যে, যদি এই জ্ঞান ও নীতির আলোকে গবেষণা করা যায়, তাহলে কৃষিক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে অনেক বেশী উৎপাদন সম্ভব। যেমন–পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল বাকারার ২৬২ নং আয়াতে বলেন– যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই শস্যবীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ শস্যদানা থাকে। আর আল্লাহ্ তাআলা যার জন্য চান (এর চেয়েও) বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ্ তাআলা প্রাচুর্যদানকারী ও সর্বজ্ঞ।

উৎপাদন যদি এতবেশি পরিমাণ সম্ভব হয়, তাহলে খাদ্য সংকট ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট সমস্যাও থাকবে না। কৃষিক্ষেত্রে অনেক বেশী উন্নতি করা সম্ভব। সেই দিন দূরে নয়, যেদিন কুরআনের এ সুসংবাদ আমরা প্রত্যক্ষ করব।

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা সূরা আবাসার ২৫-৩৩ নং আয়াতে বলেন–অতএব, মানুষ তার নিজের খাবারের দিকে লক্ষ্য করুক, (আর সে দেখুক) কিভাবে আমরা মুষলধারে পানি বর্ষণ করি। এরপর আমরা মাটিকে ভালভাবে কর্ষণ করি; এরপর আমরা এতে শস্যদানা উৎপন্ন করি। এবং আঙ্গুর ও শাকসব্জি এবং জলপাই ও খেজুর এবং ঘন বাগানসমূহ এবং ফলফলাদি ও তৃণলতা, যা তোমাদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর জন্য জীবনোপকরণ।

এ আয়াতগুলিতে চাষের গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণনা করা হয়েছে। ভাল বীজ তৈরী করার পর এ প্রশ্ন উঠে যে, কিভাবে চাষ করা হবে। সর্বপ্রথমে জমিকে পানি দিয়ে ভেজাতে হবে, তারপর হালচাষ করতে হবে। হাল যত বেশী দেয়া হবে, উৎপাদনও ততবেশি হবে। সেই সাথে পরিচর্যাও করতে হবে।

কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি ও কৃষি কাজের বিষয়ে এরূপ নসিহত কোন ধর্মই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে নাই। শুধুমাত্র কুরআন করীমেই আমরা তার বর্ণনা পাই, আর বর্তমানে বিজ্ঞানও এ ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখছে। একজন মু'মিন বান্দা যখন কুরআন করীমের আলোকে এ কাজ শুরু করে ও এর ফসল লাভ করে, তখন সে খোদা তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটি একটি অনেক বড় বিষয়, যা সংক্ষেপে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন করীমের আলোকে আমাদের কৃষক ভাইদেরকে কৃষি-কাজ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

(আল ফযল, ২৮ ডিসেম্বর, ২০১০ অবলম্বনে)

নাবিদ আহমদ লিমন

ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

প্রত্যেক জাতির মাঝে নবীর আবির্ভাব হয়েছিল

তফসীর সূরা কাউসার, তফসীরে কবীর-১০ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৩

[(হযরত মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)]

কুরআন করীমের প্রেক্ষাপটে রসূল করীম (সা.) এর পূর্বে দু'জন শরীয়তধারী নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন। (১) হযরত নূহ আলাইহেসসালাম (২) হযরত মূসা আলাইহেসসালাম। হযরত মূসা আলাইহেসসালামের কিতাব তওরাত বর্তমান আছে। কিন্তু হযরত নূহ আলাইহেসসালামের কিতাব বর্তমান নাই। কুরআন করীমে কেবল এতটুকু উল্লেখ আছে– *'ওয়া ইন্না মিন শীআতিহী লা ইবরাহীমা'*। (সাফফাত-রুকু-৩) অর্থাৎ হযরত নূহ আলাইহেসসালামের জামাত থেকেই হযরত ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন। শরীয়ত ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর, এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.) তার অনুগমনকারী নবী ছিলেন। হযরত দাউদ, হযরত জাকারিয়া, হযরত সুলায়মান এবং ইয়াহইয়া আলাইহুমুস সালাম মূসায়ী শরিয়তের অনুসারী ছিলেন। এই দুই শরিয়তবাহী নবী ব্যতিরেকে কুরআন করীমের এক বরাতে উল্লেখ রয়েছে,

'ইম্মিন উম্মাতিন ইল্লা খালাফীহা নাযীরুন' (সূরা ফাতের, রুকু-৩)। অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোন জাতি নাই, যাদের নিকট আমাদের কোন না কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই। যদি কেউ আমাদের নিকট এসে বলে, অমুক নবী দুনিয়াতে এসেছিলেন, আর বাহ্যত: তার জীবনী নবীগণের জীবনীর সাথে মিলে যায়, তবে তার জীবনের সেই আজগুবী কাহিনী ব্যতীত, যা সাধারণত

প্রক্ষিপ্ত করা হয়, এমতাবস্থায় আমরা যদি বলি, তিনি নবী নন, তাহলে আমরা আমাদের ধর্মকেই অস্বীকার করবো। যেমন, কোন হিন্দু যদি এসে বলে, বেদ খোদা তাআলার কিতাব এবং আমাদের মাঝেও খোদা তাআলার পক্ষ থেকে নবীর আবির্ভাব হতো, আর আমরা যদি বলি, তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। আবার সে যদি বলে, রামচন্দ্র নবী ছিলেন। আর আমরা যদি বলি, মিথ্যা- নবী ছিলেন। সে যদি বলে শ্রীকৃষ্ণ নবী ছিলেন এবং তার কিতাব গিতা এখনো বর্তমান আছে, যার মধ্যে তার কিছু ইলহাম লিপিবদ্ধ আছে। আর আমরা যদি বলি, এগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। পুনরায় যদি কোন বৌদ্ধ আমাদের কাছে এসে বলে, বুদ্ধ নামে একজন নবী হিন্দুস্তানে এসেছিলেন, যার সাথে খোদা তাআলা কথা বলতেন, এর উত্তরে আমরা যদি বলি, (নাউযুবিল্লাহ্) সে ধোকাবাজ ছিল। তখন তারা তৎক্ষণাত আমাদের সামনে কুরআন করীমের এই আয়াত রাখবে এবং বলবে, তোমাদের কুরআন তো বলে, প্রত্যেক জাতির মাঝে নবী এসেছে। এখন বল, যদি শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধ নবী না হয়ে থাকেন, তবে হিন্দুস্তানে কোন্ নবী এসেছিলেন? আমরা তো এই তিনজনকেই মিথ্যাবাদী বলেছি এখন আর কাকে নবী হিসেবে পেশ করতে পারবো?

আমরা কেবল এতটুকু বলতে পারবো, আমরা জানি না। তখন সে বলবে, তোমাদের কুরআনে তো উল্লেখ আছে প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক জাতিতে নবী এসেছেন, তোমরা এর প্রমাণ উপস্থাপন করো। এমতাবস্থায় আমাদের কিছুই বলার থাকবে না। তখন হয় যুক্তিহীন গোঁড়া ব্যক্তির ন্যায় হঠকারিতা করে কেবল 'না না' করতে হবে, নতুবা সেই পাঠান ব্যক্তির ন্যায় করতে হবে, যে এক টাকার তরমুজ কিনে যখন দেখল, সেগুলো পানশে, তখন সে রাগ করে সেগুলোর ওপর পেশাব করে দিয়ে মজদুরী খাটতে চলে গেল। তারপর যখন তার পেট খালি হলো আর ক্ষুধার যন্ত্রণা চরম আকার ধারণ করলো, তখন সে তরমুজের কাছে এসে একটি তরমুজ উঠিয়ে নিয়ে, "এটির উপর তো আমি পেশাব করিনি" বলেই খাওয়া শুরু করলো। এভাবে একের পর এক তরমুজ খেয়েই চলল, যখন আর মাত্র একটি তরমুজ বাকী পরে থাকে কিন্তু তখনও তার পেট ভরেনি, সে বলে উঠে, 'আরে যেগুলোর ওপর আমি পেশাব করেছিলাম, সেগুলো তো খেয়ে ফেলেছি, এটার উপর তো পেশাবই করি নাই। এটি বলে সে সেই শেষ তরমুজটাও খেয়ে ফেলে। একই অবস্থা আমাদেরও হবে। প্রথমে তো আমরা সব নবীকে মিথ্যাবাদী বলে উড়িয়ে দিব, পরে যখন সে বলবে, তাহলে বল হিন্দুস্তানে কোন্ নবী এসেছিলেন? নিরুপায় হয়ে আমাদের একথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না যে, ঠিক আছে চল, রামচন্দ্রকে নবী বলে মেনে নিলাম। শ্রীকৃষ্ণকেই নবী মেনে নিলাম, বুদ্ধকেও নবী মেনে নিলাম। নিরুপায় হয়ে যেহেতু আমাদেরকে তা স্বীকার করতে হবে, তাহলে পূর্বেই কেন স্বীকার করে নেই না? শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রকে আমাদের সূফী ও ওলীগণ স্বপ্নে দেখেছেন, এক ব্যক্তি হযরত মাযহার জানে জানানের নিকট এসে বলল, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যাবাদী ছিল। কেননা আমি স্বপ্নে দেখেছি, প্রজ্জ্বলিত আগুনের মাঝখানে হযরত কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন এবং শ্রীরামচন্দ্র কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন। এতে আমি বুঝতে পারলাম, তারা মিথ্যাবাদী ছিল।

হযরত মযহার সাহেব বলেন, স্বপ্নের তাবীর স্বপ্নের ভাষায় হয়ে থাকে। আগুন অর্থ হলো মুহাব্বতে ইলাহী। হযরত কৃষ্ণ আগুনের মাঝখানে দাড়িয়ে থাকার অর্থ হলো, তিনি মুহাব্বতে ইলাহীর কেন্দ্র বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছেন আর রামচন্দ্র যেহেতু পদমর্যাদায় তার চেয়ে ছোট, তাই তিনি কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন।

মোটকথা, কুরআন করীম এ দাবী করেছে যে , প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবীর আবির্ভাব হয়েছে। যদি কেউ আমাদের নিকট এসে বলে, আমাদের জাতির মধ্যে অমুক নবী এসে ছিলেন। তার জীবনের ঘটনাবলী যদি নবীদের জীবনের সাথে হুবহু মিলে যায়, তবে আমরা বলব, সুবহানাল্লাহ, আমাদের জন্য বিষয়টি কত সহজ।

আমি তো খ্রিষ্টান, ইহুদী এবং হিন্দুদের সর্বদাই বলি কুরআন করীম আমাদের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। তোমাদের কাজ অনেক জটিল। যেমন, যদি কোন ইহুদী বলে মূসা (আ.) নবী ছিলেন, তখন হিন্দু বলবে, রাম রাম! তিনি কিভাবে নবী হতে পারেন? আমরা যদি বলি, ইরানে যরথুস্ত আলাইহেসসালাম জন্মে ছিলেন, তবে ইহুদী এবং হিন্দু উভয়েই চমকে উঠবে। হিন্দু রাম রাম বলে উঠবে এবং ইহুদী বলে উঠবে, এলুহায়্যেম, এলুহায়্যেম। হায় আল্লাহ্! আমি কি করবো, কোন একটি পথ বের কর, যাতে যরথুস্ত (আ.) নবী প্রমাণিত না হন। আবার আমরা যদি যরুস্টারদেরকে বিল, হিন্দুস্থানে বুদ্ধ নবী এসেছেন। তখন তারা বলবে, হায় হায়! কি বলে? ঠিক আছে তাড়াতাড়ি কোন একটি উপায় বল, যার দ্বারা তাঁর নবুওয়াত খন্ডন করা যায়। কিন্তু কুরআন করীমের এই ঘোষণা ' 'ইম্মিন উম্মাতিন ইল্লা খালাফীহা নাযীরুন' (সূরা ফাতের, রুকু-৩)। বিষয়টি খুবই সহজ করে দিয়েছে। যদি কোন হিন্দু এসে বলে, হিন্দুস্তানে রাম চন্দ্র রায়, শ্রীকৃষ্ণ নবী এসেছিলেন। তবে আমি বলবো, সুবহানাল্লাহ, আমার জন্য ব্যাপারটি কত সহজে নিস্পত্তি হয়ে গেল, আমাকে পরিশ্রম করতে হলো না, তুমি নিজেই বলে দিয়েছে, আমার কুরআনও এই দাবীই করে। তুমি যদি আমকে জিজ্ঞাসা করতে, বল হিন্দুস্তানে কোন্ নবীর আবির্ভাব ঘটেছে? আমি বিপদে পড়ে যেতাম। অনুরুপ ভাবে চীনে গেলে চীনাদের কাছে শুনবো যে, সেখান কনফিউশিয়াস (আ.) নামে খোদার এক নবী এসেছিলেন। খ্রিষ্টান ইহুদী শুনে হট্টগোল পাকাবে যে, ইনি কিভাবে নবী হলেন, কিন্তু আমি বলবো, সুবহানাল্লাহ্, এটি মেনে নেয়া আমার জন্য কতই না সহজ। তারা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করতো, আচ্ছা বল, আমাদের মাঝে কে নবী হয়েছিল? তাহলে আমি মুস্কিলে পড়ে যেতাম। তারাই বলে দিয়ে আমাকে পরিশ্রমের হাত থেকে রক্ষা করেছে। কুরআন করীমের দাবীইতো এটি- 'ইম্মিন উম্মাতিন ইল্লা খালাফীহা নাযীরুন'।

আমরা ইরানে গেলে সেখানকার অধিবাসীরা বলবে, এখানে যরথুস্ত (আ.) নামে এক নবী এসেছিলেন। এটি শুনে তো খ্রিষ্টান-ইহুদী কপাল চাপড়িয়ে বলবে, ব্যাপার কি! আমরা তো মনে করতাম, কেবল আমাদের মাঝেই নবী এসেছেন। কিন্তু এটি শুনে আমার চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। আমি বলি, সুবহানাল্লাহ্, আপনি নিজেই বলে দিয়েছেন, তা না হলে আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হতো।

আমার কুরআনে তাই উল্লেখ আছে। মোট কথা, আমরা যদি শুনি, কোন জাতির মধ্যে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং তিনি তাঁর যুগে তাদের সংশোধন করেছিলেন এবং তাঁর ওপর আযাবও নাযিল হয় নাই, কেননা কুরআন বলে, 'মিথ্যাবাদী দাবী কারকের উপর আযাব বর্ষিত হয়', আমরা আলহামদুলিল্লাহ্ বলে তাঁকে গ্রহণ করবো। সুতরাং নীতিগতভাবে সকল জাতির মধ্যে নবী এসেছেন।

রশিদ আহমদ

ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

কৃতি ছাত্র

১) আমাদের কনিষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ ইউসুফ হোসেন (অনিক) ২০১২ সালের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে. এস. সি.) পরীক্ষায় জি.পি.এ ৫ (A^+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম হোসেন
ও আমানাতুল হাই

২) আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে খাকসারের ছোট ছেলে তাহের আহমদ প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ২০১২ইং জি.পি.এ ৫ (A^+) পেয়েছে এবং বড় ছেলে ফজল আহমদ J.S.C- পরীক্ষায় ২০১২ইং GPA-4.29(A) পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উভয়ে ভষ্যিৎ জীবনে জামাতের একনিষ্ঠ সেবক হয় তার জন্য আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট খাস ভাবে দোয়াপ্রার্থী।

এনামুল হক রনি (মোয়াল্লেম)
ও মোবারেকা বেগম লাভলী

সং বা দ

বিভিন্ন জামা'তে অত্যন্ত আনন্দঘন এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশে পালিত হয়েছে বাংলাদেশে জামাত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ অনুষ্ঠান।

_কয়েকটি জামাতের সংবাদ প্রকাশ করা হল:_

চরসিন্দুর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চরসিন্দুর এর উদ্যোগে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর শত বর্ষ পূর্তি উদযাপন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। ০৩-০১-২০১৩ সন্ধ্যার পূর্বেই মসজিদের এবং তার আশেপাশে মোয়াল্লেম কোয়ার্টারসহ আলোকসজ্জা করা হয়। মসজিদের রাস্তার পাশে বড় গেইট করা হয় এতে আলোকজ্জা এবং বড় ব্যানার লাগানো ছিল। বাদ মাগরিব হালকাগুলি হতে আহমদীরা তাদের পরিবার নিয়ে মসজিদে চলে আসেন। রাত ৪টায় বেদারি করা হয় এবং ৪-৩০ মি. নামায তাহাজ্জুদ আদায় করা হয়। নামায ফজরের পর ইজতেমায়ী দোয়া এবং মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য মিষ্টি জাতীয় খাবার সবাই নিজ নিজ ঘরে তৈরী করে মসজিদে নিয়ে আসেন। এরপর আহমদীয়া মুসলিম জামাত চরসিন্দুর এর প্রতিষ্ঠা প্রেসিডেন্ট জনাব মরহুম ডা: সামসুদ্দিন সাহেবের (নিজ বাড়ীতে) কবর যিয়ারত করতে করা হয়। ফিরে এসে লাওয়ায়ে আহমদীয়া এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে খাশি সদকা করা হয়। বেলা ১০টা হতে ১২টা পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ শত বর্ষ উদযাপন আলোচনা সভা করা হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চরসিন্দুর। পবিত্র কুরআন হতে তেলাওয়াত করেন ইমরান আহমদ, দলীয় নযম পরিবেশন করেন ফারিয়া হোসেন আভা এবং ফাহমিদা হোসেন জেনী। বাংলাদেশে আহমদীয়াত এ বিষয়ের উপর বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব আফজাল হোসেন ভূঞা এরপর খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে দলীয় নযম পরিবেশন করেন ইমরান আহমদ ও তাহের আহমদ (প্রান্ত) এবং এস এম সুলতান এবং এস এম মাহমুদুল হক। আহমদীয়াত এবং ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর সত্যতা এ বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন জনাব বোখারুল ইসলাম বোখারী। এরপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন এস, এম সুলতান। ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর দৃষ্টিতে একজন আদর্শ আহমদী এ বিষয়ের উপর বক্তৃতা প্রদান করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম। সবশেষে দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। উক্ত অনুষ্ঠানে ৭টি হালকার ৬১ জন আহমদী এবং ৬ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম মাহমুদুল হক

ফতুল্লা

বাংলাদেশে জামাত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মসজিদ কমপ্লেক্স আলোকসজ্জা করা হয় সদস্যরা ৩ তারিখে নফল রোযা রাখে এবং দিবাগত রাত ৪-৪৫ মি. হতে অত্যন্ত আবেগগণ পরিবেশে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হয়। মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন তাহাজ্জদ নামাযের ইমামতি করেন। মসজিদে ৫৮ জন এবং অন্যরা নিজ নিজ বাড়ীতে নামায আদায় করেন। ফজর নামায ও দরসে কুরআনের পর শতবার্ষিকী লগো উন্মোচন করা হয়। লগো উন্মোচনের পর ইজেতামযী দোয়া করা হয়। তারপর দু'টি খাসি সদকা দেয়া হয়। বিভিন্ন বাসা থেকে আনা পিঠা মিষ্টি সম্মিলিত ভাবে আপ্যায়ন করা হয়। আনসার, খোদ্দাম ও নাসেরাতদের কিছু প্রতিযোগিতা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিবেশীদের মাঝেও মিষ্টি এবং পিঠা বিতরণ করা হয়। বাদ জুমুআ বাংলাদেশে আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন শীর্ষক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা করা হয়। এতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ফরিদ আহমদ। সুললিত কণ্ঠে নযম পাঠ করেন, মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন। তারপর পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির পাতা হতে নেওয়া অনুভূতি সর্বজনাব কামাল পাশা, কাজী মোবাশ্বের আহমদ, ডা. কামরুল হাসান সরকার, সামসুদ্দিন আহমদ, ডা. আবু নাছির ও স্থানীয় মোয়াল্লেম। সবশেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সামপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফতুল্লা

বিষ্ণুপুর

গত ৩ জানুয়ারী ২০১৩ রোজ বৃহস্পতিবার দিনে নফল রোযার মধ্য দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের শতবার্ষিকী জুবিলী কর্মসূচী আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিষ্ণুপুর আরম্ভ করে। এতে ১৫ জন আহমদী নফল রোযা রাখেন। রাতে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হয়। এতে ১৮ জন আহমদী অংশগ্রহণ করেন। বাদ ফজর কুরআন তেলাওয়াত, ইজতেমায়ী দোয়া, মিষ্টি বিতরণ এবং স্থানীয় জামাতের পক্ষ থেকে খাসি সদকা করা হয়। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মসজিদের সামনের বারান্দার শত বার্ষিকী লোগো, বেনার, ফেষ্টুন প্রদর্শন করা হয়। সকাল ৮টায় মক্তব ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তালিমী বিষয়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আহমদী ছাত্রছাত্রীদের সাথে ৮ জন অ-আহমদী ছেলেমেয়েও অংশগ্রহণ করেন। বাদ জুমুআ স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট আব্দুল হাকিম-এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পবিত্র কুরআন করেন পর্ন্য ভুইয়া এবং নযম পরিবেশন করেন মারুফ আহমদ। আলোচনায় বক্তব্য রাখেন জনাব শফিকুল আলম, যয়ীম, মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ বিষ্ণুপুর, জনাব আমীর মাহমুদ ভুইয়া, জেনারেল সেক্রেটারী, বিষ্ণুপুর, প্রধান অতিথি প্রবাসী আহমদী ঘাটুরার জনাব সেলিম আহমদ হাজারীর বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানের সভাপতি সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন।

আবদুল হাকিম

কুমিল্লা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুমিল্লার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় দিকনির্দেশনা অনুযায়ী গত ০৩/০১/২০১৩ দিনগত রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। বাদ ফজর পবিত্র কুরআন থেকে দরস ও ব্যক্তিগত তেলাওয়াত করা হয়। তারপর শতবর্ষ উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, ইজতেমায়ী দোয়া ও শতবার্ষিকী লোগো উন্মোচন করা হয়। তারপর মিষ্টি বিতরণ এবং আশে পাশে ১৮টি প্রতিবেশীর বাড়িতে মিষ্টি পাঠানো, কবর জিয়ারত, খাসি সদকা দেয়া হয়। বাদ জুমুআ শতবার্ষিকী জুবিলী নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। একইভাবে কুমিল্লা জামাতের হালকাগুলোতেও পালিত হয়।

মোহাম্মদ জাহীদুল ইসলাম

পুরুলিয়া

গত ০৩/০১/২০১৩ তারিখ দিবাগত রাত্রিতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের শতবার্ষিকী জুবিলী প্রোগ্রাম হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামাত পুরুলিয়া বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । তাহাজ্জদ নামাযে ৪৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

আল আমীন হক তুষার

তেজগাঁও

আহমদীয়া মুসলিম জামাত তেজগাঁও-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় দিকনির্দেশনা অনুযায়ী গত ০৩/০১/২০১৩ দিবাগত রাতে স্থানীয় জামে

মসজিদে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। এ উপলক্ষে লাজনা, খোদ্দাম, আতফাল এবং আনসারুল্লাহর সদস্যরা রাতে মসজিদে অবস্থান করেন। তাহাজ্জুদ নামাযের ইমামতি করেন স্থানীয় জামাতের মোয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ সুমন। বাদ ফজর বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবর্ষ উপলক্ষে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। তিনি বাংলাদেশে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাহাবীদের এবং হযরত মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ (রাহে.) সাহেবের অবদানের কথা তুলে ধরেন। ইজতেমায়ী দোয়া ও শতবার্ষিকী লোগো উন্মোচন করা হয়। তারপর সবার ঘরে তৈরী করা মিষ্টি জাতীয় খাবার বিতরণ করা হয়। খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও এর ব্যবস্থাপনায় খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে মসজিদ প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়, নানা প্রকারের ফুলের টব দিয়ে সাজানো হয় এবং লাজনা ইমাল্লাহর পক্ষ থেকে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। বাদ জুমুআ আহমদীদের ঘরে তৈরী করা বিভিন্ন খাবার পরিবেশন করা হয়।

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ

৬ষ্ঠ বার্ষিক কেন্দ্রীয় তালিম-তরবিয়তী ক্লাস-আতফাল' ২০১২ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের উদ্যোগে গত ২১ হতে ২৮ শে ডিসেম্বর ইং তারিখ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ বার্ষিক কেন্দ্রীয় তালিম-তরবিয়তী ক্লাস-আতফাল' ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। এবছর সারা দেশ থেকে শুধুমাত্র ১১-১৫ বছরের তিফলদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তীব্র শীতকে উপেক্ষা করে ১৩১ জন তিফল এতে অংশ নেয়। ২১শে ডিসেম্বর বাদ জুমুআ মোহতরম সদর সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর দোয়ার মাধ্যমে এই ক্লাসের সূচনা হয়।

এবছর তালিম-তরবিয়তী ক্লাসে কুরআন নাযেরা, শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ এবং অর্থসহ নামাজ শিক্ষা- এই ৩ টি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। আয়োজক কমিটি ছাত্রদের সুবিধার্থে সম্পূর্ণ সিলেবাস বই আকারে ছাপিয়ে তা প্রথম দিনেই সকল ছাত্রের হাতে তুলে দেয়া হয়। এবছর ১৮ জনকে কুরআন নাযেরা, ৬৭ জনকে অর্থসহ নামায শেখতে সক্ষম হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এছাড়াও অর্থসহ হাদিস, তবলিগী মাসলা-মাসায়েল, দৈনন্দিন জীবনে আদব-কায়দা ও নযম ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ৮ দিনের এ ক্লাসের ০৫ দিনই বাদ মাগরিব হতে এশার পূর্ব পর্যন্ত তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ছাত্রদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী যেমন পড়ালেখার প্রয়োজনীয়তা, উত্তম পদ্ধতি, বন্ধু নির্বাচন, মালী এবং ওয়াক্ত কুরবানী, আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ছাত্রদের মোট ১০ টি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলকেই দৈনিক ফজরের নামাযের জন্য বেদারি, খাদ্য বন্টন, মসজিদ ও মাঠে ওয়াকারে আমল করানো হয়। মোট ০৫ দিন ক্লাস করানোর পর বয়সের ভিত্তিতে দুইটি ভাগে বিভক্ত করে পঠিত সকল বিষয়ের উপরে বৃহস্পতি ও শুক্রবার দু'দিন পরীক্ষা নেয়া হয়। তালিমী প্রতিযোগীতার বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

২৮শে ডিসেম্বর বাদ জুমুআ মোহতরম সদর সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনি অধিবেশন ও পুরস্কার বিতরনীর মাধ্যমে এ ক্লাসের সমাপ্তি হয়। যে সকল ছাত্র এ ক্লাসে কুরআন নাযেরা শুরু করেছে তাদের প্রত্যেককে একটি করে কুরআন শরীফ উপহার দেয়া হয়। এবছর তালিম-তরবিয়তী ক্লাসে দেশের সর্বমোট ৩৫ টি মজলিস হতে আতফালরা অংশগ্রহণ করেন।

মুহাম্মদ জাহেদ আলী

কৃতি ছাত্র/ছাত্রী

১) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের সদস্য জনাব, এস. এম. শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ১ম পুত্র ফরিদ আহমেদ মাহী ২০১২ সালের পি.এস.সি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বি.এন. স্কুল এন্ড কলেজ থেকে সকল বিষয়ে A+ অর্থাৎ G.P.A-5 পেয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। সে একজন ওয়াকফে নও-(০৭৭২৪-বি)।

সে মুহাম্মদ নুরু মিয়া সাহেবের ছেলের ঘরের নাতি ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল্লাহ্ পাটোয়ারীর মেয়ের ঘরের নাতী। ফরিদ আহমদ মাহী যেন নেক আমলের উপর থেকে দ্বীন-দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে সে জন্য সে জামাআ'তের সকল ভাই-বোনদের কাছে দোয়া প্রার্থী।

খালিদ আহামেদ সিরাজী

২) অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, আমাদের তৃতীয় কন্যা রেজওয়ানা তৌহিদ বুশরা ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত জে এস সি পরীক্ষায় পটুয়াখালী সরকারী বালিকা বিদ্যালয় থেকে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সকল বিষয়ে A^+ সহ GPA-5 লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। তার উত্তোরত্তর সফলতার জন্য সবার কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

এস, এম, তৌহিদুল ইসলাম (মোয়াল্লেম)
ও *শাহনাজ পারভীন বাবলী*, পটুয়াখালী

জরুরী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের জন্য একজন ক্যাশিয়ার আবশ্যক। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

১. আবেদকারীর বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৩০ এর মধ্যে। উপযুক্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

২. কমপক্ষে এস.এস.সি পাশ হতে হবে। হিসাব কাজে যোগ্য ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৩. জামাত ও মজলিসি চাঁদা পরিশোধকারী হতে হবে।

৪. ঢাকার কেন্দ্রে এককভাবে থাকবে। (পারিবারিক আবাসন কোনভাবেই দাবী করা যাবে না)।

৫. নির্বাচিত হলে কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ হলে প্রাথমিকভাবে চাকুরীতে নিয়োগ পাবেন। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণকাল বৃদ্ধি হতে পারে।

৬. প্রবেশন প্রাথমিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীর পূর্ণ ৬ (ছয়) প্রবেশনকাল হিসাবে গণ্য হবে। এ সময়ে তার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক প্রতিয়মান না হলে তাকে নোটিশ ও ক্ষতিপূরণ ছাড়া চাকুরি হতে অব্যাহতি দেয়া হতে পারে।

৭. প্রশিক্ষণকালীন সময় মাসে টাকা ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা ভাতা প্রাপ্য হবেন। প্রবেশন পিরিয়ডে মাসে টাকা ৪,০০০/- ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৮. প্রবেশনকাল শেষে প্রথম ৩ (তিন) বৎসর বেতন (স্কেল ৪,৯০০-৮৫৫৫৮৩-১০৫-৬৮৪০-১৩৫-৭৯২০) এবং তিন বৎসর পর বেতন স্কেল টাকা ৫২০০-১০৬-৬০৪৮-১২৬-৭৫৬০-১৬০-৮৮৪০/- হবে

৯. মাসিক বেতনের সমপরিমাণ প্রতিমাসে ঈদের বোনাস প্রাপ্ত হবেন।

১০. আগামী ১৫/০২/২০১৩ইং তারিখের মধ্যে সেক্রেটারী বোর্ড অফ গভর্নরস, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, ৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১ ঠিকানাতে দরখাস্ত পৌছাতে হবে।

১১. নিম্নরূপ আবেদন করতে হবে।

(১) নাম ঃ
(২) পিতার নাম ঃ
(৩) মাতার নাম ঃ
(৪) স্থায়ী ঠিকানা ঃ
(৫) বর্তমান ঠিকানা ঃ
(৬) জন্ম তারিখ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- **জনতা সেনেটারী**
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 75 | 13th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th January, 2013 Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com